সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কুরআন করীমের আলোকে মহানবী (সা.)	২
হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী	৩
জলসা সালনা কাদিয়ান ২০১৭ উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার কতৃক প্রদত্ত সমাপনী ভাষণ	৫
মহানবী (সা.)-এর বহুবিবাহ এবং এর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা	১০
মহানবী (সাঃ) এর জীবনী-মক্কা বিজয়ের ঘটনার আলোকে	১৫
দাওয়াতে ইলাল্লাহ: সীরাত আঁ হযরত (সা.)	১৯
আঁ হযরত (সা.)-এর সরল ও সাধারণ জীবন	২৬
মহানবী (সা.) শান্তির দূত	২৮

সম্পাদকীয়

তোমরা তবলীগ কর এবং কারোর হেদায়াতের কারণ হও। আমাদের তবলীগ করা এবং পৃথিবীর হেদায়াতের জন্য সময় ব্যায় করা আবশ্যক

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবিষয়ে ভীষণভাবে ব্যাকুল থাকতেন যেন মানুষ আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে, নিজেদের স্রষ্টা ও প্রভুকে চেনে এবং একত্ববাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। নবীদের প্রথম কাজই হল ধরাপৃষ্ট থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁর বক্ষে মানুষের ঈমান আনার বিষয়ে এত প্রবল ব্যগ্রতা ছিল যে, আল্লাহকে বলতে হয়েছে لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ অর্থাৎ হে মহম্মদ (সা.) তুমি এই দুঃখে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে যে, মানুষ ঈমান আনছে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) একবার হযরত আলি (রা.) কে বলেন: খোদার কসম! তোমার হাতে এক ব্যক্তির হেদায়াত পাওয়া উন্নত মানের লাল উট লাভের চেয়েও শ্রেয়।

(মুসলিম কিতাবুল ফাযায়েল, আলি বিন আবু তালিব, এবং বুখারী কিতাবুল জিহাদ)

এই প্রসঙ্গে পাঠকবর্গের উদ্দেশ্যে কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরা হচ্ছে যে, মানুষ তাদের প্রভু ও সৃষ্টিকর্তার উপর ঈমান আনায় আঁ হযরত (সা.) কতটা আনন্দিত হতেন।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, এক ইহুদী ছেলে আঁ হযরত (সা.)-এর সেবক ছিল। সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আঁ হযরত (সা.) তাকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে যান। তার শিরদেশে বসে অসুস্থতা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার জন্যও আহ্বান করেন। সেই ছেলে নিজের পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করে যে তার পাশেই বসেছিল। তার পিতা বলল, হুযুরের কথায় সম্মত হও। অতএব, সে ইসলাম গ্রহণ করে। হুযুর (সা.) প্রসন্ন চিত্তে সেখান থেকে ফিরে আসার পথে বলেন, সমস্ত প্রশংসা সেই সম্মানিত আল্লাহ্‌র জন্য যিনি এই যুবককে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করলেন। (বুখারী কিতাবুল জানায়েয)

এতে সন্দেহ নেই যে, ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানো তাঁর কর্তব্য ছিল যে পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সেই কাজই তিনি আজীবন সম্পাদন করে গেছেন। কিন্তু এই দাওয়াত ও তবলীগের পেছনে মানব জাতির প্রতি তাঁর অপার ভালবাসা, স্নেহ এবং সহানুভুতিও ক্রীয়াশীল ছিল। নবীগণ মানবজাতির প্রতি এমন ভালবাসা রাখেন যেরূপে একজন মমতাময়ী মা নিজের সন্তানকে ভালবাসে, বরং তার চেয়েও বেশি। এই কারণেই সেবকের ঈমান আনা এবং পরিণামে আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ায় তিনি (সা.) যারপরনায় প্রীত হয়েছিলেন। আদ্দাশের ঈমান আনার ঘটনা ছাড়াও আরও একটি কৌতুহল উদ্দীপক ঘটনা নিম্নে বর্ণনা করা হল।

নবুবী ১০ই শওয়াল আঁ হযরত (সা.) নিঃসঙ্গ তায়েফের উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিছু রেওয়ায়েতে আছে যে, যায়েদ বিন হারসাও সঙ্গে ছিলেন। সেখানে তিনি দশ দিন অবস্থান করেন এবং শহরের অনেক সর্দারদের সঙ্গে একের পর এক সাক্ষাত করেন। কিন্তু সেই সময় ঈমান আনা মক্কার মত এই শহরের ভাগ্যেও ছিল না। তারা সকলেই অস্বীকার করে, এমনকি ঠাট্টাবিদ্রূপ করে। সবশেষে তিনি তায়েফের প্রধান সর্দার আব্দ ইয়ালিলের কাছে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেন, কিন্তু সেও এক কথায় অস্বীকার করে বরং বিদ্রূপে স্বরে বলে, 'যদি আপনি সত্যবাদী হন তবে আপনার সঙ্গে কথা বলার আমার সাহস নেই আর যদি আপনি মিথ্যাবাদী হন তবে কথা বলা নিরর্থক। তাঁর কথায় শহরের যুবকদের উপর কুপ্রভাব না পড়ে সেই আশঙ্কায় সে মহানবী (সা.)কে বলল, আপনার এখান থেকে চলে যাওয়ায় উত্তম, কেননা, এখানে কেউ আপনার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত নয়। এরপর সেই হতভাগা শহরের ভবঘুরে মানুষদের তাঁর পিছনে লেলিয়ে দেয়। আঁ -হযরত (সা.) যখন শহর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এরা চিৎকার করতে করতে তাঁর পিছু ধাওয়া করে এবং পাথর নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করে যার ফলে তাঁর সমস্ত শরীর রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। তিন মাইল পথ পর্যন্ত অবিরাম ধারায় গালি দিতে দিতে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে।

তায়েফ থেকে তিন মাইল দূরে মক্কার সর্দার উতবা বিন রাবিয়ার একটি বাগান ছিল। আঁ হযরত (সা.) সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আর বর্বর ও অত্যাচারীর দল ক্লান্ত হয়ে ফিরে যায়। এখানে একটি গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেন:

" হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! আমি নিজের শক্তিহীনতা, অপরিণামদর্শিতা এবং মানুষের মোকাবেলায় নিজের অসহায়ত্বের কথা তোমার কাছেই নিবেদন করছি। হে আমার খোদা! তুমি পরম দয়ালু এবং দুর্বল ও অসহায়দের তুমিই তত্ত্বাবধায়ক এবং রক্ষক। তুমিই আমার প্রভু।..... আমি তোমার মুখের জ্যোতির আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কেননা, তুমিই জুলুম দূরীভুত কর এবং মানুষকে ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কল্যাণের উত্তরাধিকারী কর।

উতবা ও শেবা সেই সময় বাগানে ছিলেন। তারা আঁ হযরত (সা.)কে এই অবস্থায় দেখে দূরের বা নিকটের আত্মীয়তা বা জাতির টানে কিম্বা কোন অজ্ঞাত কোন ধারণার বশবর্তী হয়ে আদ্দাশ নামক নিজের এক খৃষ্টান সেবকের হাতে একটি আঙুরের গোছা তাঁর কাছে পাঠান। তিনি তা গ্রহণ করেন এবং আদ্দাশকে সম্বোধন করে বলেন, ' তুমি কোন দেশের বাসিন্দা এবং কোন ধর্মের অনুসারী?' সে উত্তর দিল, ' আমি নেনেভার অধিবাসী এবং খৃষ্টধর্মের অনুসারী।' তিনি (সা.) বললেন, 'সেই নেনেভা যা খোদার পুণ্যবান বান্দা ইউনুস বিন মাত্তার বাসস্থান ছিল?' আদ্দাস উত্তর দিল, ' হ্যাঁ, কিন্তু আপনি ইউনুসের বিষয়ে কিভাবে জানলেন?' তিনি (সা.) বললেন, ' সে আমার ভাই ছিল, কেননা, সেও আল্লাহ্‌র নবী ছিল, আর আমিও আল্লাহ্‌র নবী।' অতঃপর তিনি তাকে ইসলামের তবলীগ করলেন যা আদ্দাসকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে, এতটাই যে সে এগিয়ে এসে নিষ্ঠা ও আবেগভরে আঁ হযরত (সা.)-এর হাত চুম্বন করে ফেলে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে উতবা এবং শেবাও সেই দৃশ্য দেখে ফেলে। তাই আদ্দাস যখন তাদের কাছে ফিরে গেল, তারা বলল, ' আদ্দাস! তোমার কি হয়েছিল, কি কারণে তুমি এই ব্যক্তির হাত চুম্বন করলে? এই ব্যক্তি তোমার ধর্ম নষ্ট করবে, আর তোমার ধর্ম এর ধর্মের থেকে উত্তম।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা মির্যা বশীরুদ্দীন সাহেব এম.এ, পৃষ্ঠা: ১৮২, ২০০৪ সালে কাদিয়ানে প্রকাশিত)

আদ্দাসের ঈমান আনয়ন সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) জাদুময় বর্ণনার কয়েকটি লাইন পাঠ করুন, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাবেন।

'আদ্দাস ছিল নেনেভার অধিবাসী এবং খৃষ্টান। যখন সে আঙুরের থালাটি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে রেখে দিল এবং তিনি

এরপর ২৫-এর পাতায়.....

তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাহাদেরই মধ্য হইতে এক রসূল আবির্ভূত করিয়াছেন, যে তাহাদের নিকট তাঁহার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করে, এবং তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়।

۞ هُوَالَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِّیّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَیُزَكِّیْهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۙ○ وَّاٰخَرِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ وَهُوَالْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ○ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْهِ مَنْ یَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ ○ (سورۃ الجمعہ آیت 3،4)

তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাহাদেরই মধ্য হইতে এক রসূল আবির্ভূত করিয়াছেন, যে তাহাদের নিকট তাঁহার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করে, এবং তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও পূর্বে তাহারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল; এবং (তিনি তাহাকে আবির্ভূত করিবেন) তাহাদের মধ্য হইতে অন্য লোকের মধ্যেও যাহারা এখন পর্যন্ত তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই। এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

(সূরা জুমা, আয়াত: ৩-৪)

আয়াত নং ৩: এই আয়াতে আঁ হযরত (সা.)-এর যে অনন্য মহিমার কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা হল এই যে, তিনি তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারীদেরকে কেতাবের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শেখানোর পূর্বে তিলাওয়াতের সঙ্গে তাদের পবিত্রকরণও করতেন। কুরআন করীম এক মহান নিদর্শন। এরপূর্বে সুরা বাকারার ১৩০ নং আয়াতে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর দোয়া বর্ণিত হয়েছে যা হযরত রসুলে করীম (সা.)-এর আবির্ভাবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। তিনি এমন এক রসুলের আবির্ভাবের দোয়া করেন যিনি আল্লাহ্ তা'লার আয়াত পাঠ করে শোনাবেন, তাদেরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শেখাবেন এবং এর মাধ্যমে তাদের পবিত্রকরণ হবে। এই দোয়ার গ্রহণীয়তার উল্লেখ তিনটি স্থানে রয়েছে। এবং তিনটি স্থানেই বলা হয়েছে যে আঁ হযরত (সা.) তিলায়াতের পবিত্র করণ করতেন, অতঃপর তাদেরকে কেতাব এবং প্রজ্ঞা শেখাতেন। অতএব এটি কুরআন করীমের বিশেষ সম্মান যা ২৩ বছর ধরে নাযেল হয়েছে, কিন্তু এর কোন আয়াতে কোথাও কোন সংঘাত নেই।

(আয়াত: ৪) হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) এই আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় লিখেন-এই আয়াতে যে 'আখারীন'-দের কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে সেই রসুলের আবির্ভাবের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে যা পূর্বের আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। (هُوَالَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِّیّٖنَ رَسُوْلًا) কিন্তু এই আয়াতের শেষে সেই চারটি ঐশী বৈশিষ্টাবলী বর্ণিত হয় নি যা ২ নং আয়াতের শেষে বর্ণিত হয়েছে, বরং কেবল আযীয' এবং 'হাকীম'-এর বৈশিষ্ট্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, প্রারম্ভে যে রসূলের উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি স্বয়ং পুনরায় আবির্ভূত হবেন না, তাঁর অপর কোন প্রতিচ্ছায়াকে আবির্ভূত করা হবে যে শরিয়তধারী নবী হবে না। উল্লেখ্য বিষয় হল, হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কেও এই দুটি ঐশী বৈশিষ্ট্যই বর্ণিত হয়েছে। যেরূপ বলা হয়েছে بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِیْزًا حَكِیْمًا

۞ قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَیْكُمْ وَلَاۤ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِیْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○ (سورۃ یونس آیت نمبر 17)

তুমি বল, 'যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে আমি ইহা তোমাদের পড়িয়া শুনাইতাম না এবং তিনিও উহা সম্বন্ধে তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতেন না। নিশ্চয় আমি ইতিপূর্বে তোমাদের মধ্যে এক সুদীর্ঘ জীবন যাপন করিয়াছি, তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না?'

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

রসূলে করীম (সা.) -এর উপর মুশরিকরা অভিযোগ আরোপ করত যে, তিনি খোদার নামে মিথ্যা রচনা করে কুরআন শরীফ নিজের পক্ষ থেকেই রচনা করেছেন। فَقَدْ لَبِثْتُ فِیْكُمْ عُمُرًا আয়াতে প্রবলভাবে এই অভিযোগ খণ্ডন করা হয়েছে যে, সেই রসূল যাকে তোমরা সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত বলতে। দাবীর পূর্বে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তো সে কখনও মানুষের বিষয়ে মিথ্যা বলে নি। এখন হঠাৎ খোদার ব্যাপারে কিভাবে মিথ্যা বলতে শুরু করল।

۞ اَفَمَنْ كَانَ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَیَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰۤی اِمَامًا وَّرَحْمَةً ؕ اُولٰٓئِكَ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ یَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِیْ مِرْیَةٍ مِّنْهُ ۫ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ ○ (سورۃ ہود آیت 18)

সুতরাং যে ব্যক্তি তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট নিদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাহার অনুসরণ করিয়া (তাহার সত্যতা প্রতীয়মানের জন্য) তাঁহার পক্ষ হইতে একজন সাক্ষী আগমণ করিবে, এবং তাহার পূর্বে মূসার গ্রন্থ পথ-নির্দেশক ও রহমত স্বরূপ রহিয়াছে সে কি (মিথ্যা দাবীদার) হইতে পারে? তাহারা (মূসার প্রকৃত অনুসারীগণ) তাহার উপর ঈমান আনয়ন করে এবং এই (বিরুদ্ধবাদী) দলগুলি হইতে যে তাহাকে অস্বীকার করিবে, তাহার প্রতিশ্রুত স্থান অগ্নি। সুতরাং তুমি এই বিষয়ে সন্দিহান হইওনা না। নিশ্চয় ইহা তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত সত্য; কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

অর্থাৎ তাঁর উম্মতের মধ্যেও এক প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের আবির্ভাব হবে যিনি নিজের ইলহামের মাধ্যমে এর সত্যায়ন করবেন। অর্থাৎ মহম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর তিনটি সাক্ষী বিদ্যমান। এক তিনি নিজেই যুক্তিপ্রমাণাদি রাখেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর উম্মতে আউলিয়াআল্লাহ্ জন্ম নিতে থাকবে যারা তাঁর সত্যতার সাক্ষী দিবে। তৃতীয়ত এরপূর্বেও হযরত মূসা (আ.)-এর গ্রন্থ তাঁর সত্যতার সাক্ষী দিচ্ছে। এতগুলি সাক্ষী অন্য কোন নবীর সপক্ষে নেই।

(তফসীর সাগীর, পৃষ্ঠা: ৩৫৩)

۞ وَاِذْ قَالَ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ یٰبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ یَّاْتِیْ مِنْۢ بَعْدِی اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَیِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ○ (الصف آیت 7)

এবং (স্মরণ কর– যখন মরিয়মের পুত্র ঈসা বলিয়াছিল, 'হে বনী ইসরাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র রসূল, উহার (ভবিষ্যদ্বাণী) সত্যায়নকারীরূপে যাহা তওরাত হইতে আমার সম্মুখে আছে, এবং এমন এক রসূলেরও সুসংবাদদাতা রূপে যে আমার পরে আসিবে, যাহার নাম হইবে আহমদ।' অতঃপর যখন সে তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আসিল, তাহারা বলিল, 'ইহাতো প্রকাশ্য যাদু।'

(সূরা সাফ, আয়াত: ৭-৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) এই আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় লিখেন:

৭নং আয়াত: এই আয়াতে আঁ হযরত (সা.)-এর আহমদ নামে আত্মপ্রকাশ করার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তিনি (সা.) মহম্মদ হিসেবে আবির্ভূত হন যে সম্পর্কে হযরত মুসা(আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং আহমদ হিসেবেও যার ভবিষ্যদ্বাণী হযরত ঈসা (আ.) করেছিলেন।

১০ নং আয়াত: এই আয়াতে আঁ হযরত (সা.)কে বিশ্বনবী হিসেবে স্পষ্টরূপে তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি কেবল এক ধর্মের অনুসারীদের প্রতি প্রেরিত হন নি, বরং তিনি সমগ্র জগতে বিদ্যমান প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তিনি সকলের উপর জয়যুক্ত হবেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: এটি কুরআন করীমের একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী যার সম্পর্কে গবেষণা বিশারদরা ঐক্যমত রয়েছে যে, এটি মসীহ মওউদ-এর হাতে পূর্ণ হবে। .

(তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানীা খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা: ২৩২)

আঁ হযরত (সা.)-এর স্বভাব-চরিত্র এবং জীবনযাপন পদ্ধতি কুরআন করীমের সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

আঁ হযরত (সা.) প্রতাপান্বিত চেহারার মানুষ ছিলেন। চেহারার মধ্যে এমন উজ্জ্বলতা ছিল যেন পূর্ণিমার চাঁদ। তিনি মিতবাক ছিলেন। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না,কিন্তু কথা বললে স্পষ্ট করে বলতেন। তাঁর কথা সংক্ষিপ্ত কিন্তু বাগ্মিতাপূর্ণ, প্রজ্ঞাময় এবং পূর্ণাঙ্গীন, যা অনর্থক কথার সংমিশ্রন থেকে পবিত্র থাকত, তাতে কোন প্রকার ঘাটতি বা সংশয় থাকত না। কথার মধ্যে কারো প্রতি ভর্ৎসনা বা অবজ্ঞা থাকত না, তিনি কারোর অসম্মান করতেন না বা খুঁত বের করতেন না। ছোট ছোট কল্যাণকেও বড় হিসেবে প্রকাশ করতেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুণ প্রকট ছিল।

হযরত হাসান বিন আলি (রা.) বর্ণনা করেন, ‘ আমি আমার মামা হিন্দ বিন আবি হালাকে আঁ হযরত (সা.)-এর দেহাবায়ব বা চেহারা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর দেহাবায়ব বর্ণনা করার বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। ইচ্ছা ছিল তিনি আমাকে এমন কথা বর্ণনা করেন যা আমি ভালভাবে স্মরণ রাখি। হিন্দ বলেন, আঁ হযরত (সা.) প্রতাপান্বিত চেহারার মানুষ ছিলেন। চেহারার মধ্যে এমন উজ্জ্বলতা ছিল যেন পূর্ণিমার চাঁদ। মধ্যম উচ্চতার, অর্থাৎ খুব বেশি দীর্ঘকায় থেকে সামান্য ছোট আর বেঁটেদের থেকে সামান্য লম্বা। মাথার আয়তন বড়, ঈষৎ কোঁকড়ানো এবং ঘন চুল কানের লতি পর্যন্ত নেমে আসত। সিঁথি স্পষ্ট চোখে পড়ত। গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। চওড়া ললাট। চোখের ভ্রু দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম, কিন্তু লোমশ আর ভ্রুদ্বয় পরস্পর পৃথক ছিল। ভ্রুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানের শুভ্রতা লক্ষণীয় ছিল, যা ক্রোধের সময় স্পষ্টতর হয়ে উঠত। নাক দীর্ঘ খাড়া ও পাতলা, যার উপর জ্যোতির আভা ফুটে উঠত এবং আবছা দৃষ্টিতে কেউ দেখলে তা উঁচু দেখতে পেত। গায়ের লোম ঘন, গণ্ডদেশ কোমল এবং মসৃণ ছিল। মুখ চওড়া, দাঁতগুলি উজ্জ্বল সাদা। চোখের পলক হালকা। কাঁধ সোজা আর করা রৌপ্যের মত সাদা, যার কিছু অংশ উজ্জ্বল লাল ছিল। মাঝারি গড়ন। দেহের গঠন পাতলা কিন্তু সুঠাম। বক্ষদেশ ও পেট সমান। বুক প্রশস্ত। অস্থিসন্ধি গুলি মজবুত ও সুঠাম ছিল। উজ্জ্বল ত্বক কোমল এবং নরম ছিল। বুক ও পেট লোমশহীন, কিন্তু একটি সূক্ষ্ম লোমের রেখা বুক থেকে নাভি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দুই হাতের কনুই পর্যন্ত এবং কাঁধে সামান্য কিছু লোম ছিল। হাতের তালু প্রশস্ত এবং মাংসল ছিল। আঙুলগুলি দীর্ঘ এবং গোলাকার ছিল। পায়ের পাতা মাংসল, কোমল এবং চকচকে ছিল, এতটাই যে পানিও দাঁড়াতে পারত না। হাঁটার সময় পা পুরোপুরি উঠাতেন। চলার গতি গাম্ভীর্যপূর্ণ, কিন্তু কিছুটা দ্রুত হাঁটতেন যেন উচ্চতা থেকে নেমে আসছেন। কারো দিকে ফিরে তাকালে চেহারার অভিমুখ সম্পূর্ণভাবে তার দিকে ঘুরিয়ে দিতেন। দৃষ্টি সব সময় নীচের দিকে রাখতেন। মনে হত যেন আকাশের থেকে মাটির দিকেই তাঁর দৃষ্টি বেশি থাকত। তিনি প্রায় অর্ধ উন্মিলিত দৃষ্টিতে দেখতেন। সাহাবাদের পিছনে পিছনে হেঁটে যেতেন এবং তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। প্রত্যেক সাক্ষাতকারীকে সালাম করতেন।

(শামায়েল তিরমিযি)

হযরত হাসান বিন আলি (রা.) বর্ণনা করেন, ‘ হিন্দ বিন আবি হালাকে আঁ হযরত (*সা.)-এর বাচনভঙ্গি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আঁ হযরত (সা.) দেখে সব সময় এমন মনে হত যেন তিনি অবিরাম কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রয়েছেন আর কোন চিন্তার কারণে কিছুটা অস্বস্তিতে আছেন। তিনি মিতবাক ছিলেন। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না,কিন্ত কথা বললে স্পষ্ট করে বলতেন। তাঁর কথা সংক্ষিপ্ত কিন্তু তা বাগ্মিতাপূর্ণ, প্রজ্ঞাময় এবং পূর্ণাঙ্গীন থাকত, যা অনর্থক কথার সংমিশ্রন থেকে পবিত্র থাকত। কিন্তু তাতে কোন প্রকার ঘাটতি বা সংশয় থাকত না। কথার মধ্যে কারো প্রতি ভর্ৎসনা বা অবজ্ঞা থাকত না, তিনি কারোর অসম্মান করতেন না বা খুঁত বের করতেন না। ছোট ছোট কল্যাণকেও বড় হিসেবে প্রকাশ করতেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুণ প্রকট ছিল। কোন বিষয়ের নিন্দা করতেন না। আর এত বেশি প্রশংসাও করতেন না যেন সেটি তাঁর অত্যন্ত পছন্দ। খাবার সুস্বাদু ও বা স্বাদহীন হলে প্রশংসা বা নিন্দার ক্ষেত্রে যমীন আসমান টেনে আনা তাঁর স্বভাবে ছিল না। সব সময় মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন। জাগতিক কোন বিষয় নিয়ে না কখনও ক্ষুন্ন হয়েছেন, আর না কখনো অভিমান করেছেন। কিন্তু যদি সত্যের অবমাননা হত বা সত্যকে ধামাচাপা দেওয়া হত, তবে তাঁর ক্রোধের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারত না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার সমাধান হয়, তিনি স্বস্তিতে থাকতেন না। নিজের জন্য কখনও রাগ করেন নি, আর না তিনি কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। ইঙ্গিত করলে, পুরো হাত ব্যবহার করতেন, কেবল আঙুল নাড়াতেন না। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলে, হাত উল্টো করে দিতেন। কোন বিশেষ বিষয়ের উপর জোর দিলে এক হাতকে অপর হাতের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে দিতেন যে, ডান হাতের তালু দিয়ে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর আঘাত করতেন। কোন অপ্রিয় জিনিস দেখলে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। ভীষণ আনন্দিত হলে চোখদুটি সামান্য বন্ধ করে নিতেন। তাঁর সব থেকে বেশি হাসি চওড়া মৃদু হাসি পর্যন্তই ছিল। অর্থাৎ অট্টহাসি করতেন না। হাসির সময় দাঁতগুলি এমনভাবে দেখা যেত যেন মেঘ থেকে খসে পড়া শুভ্র শিলা।

(শামায়েল তিরমিযি)

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.)-এর উচ্চতা মাঝারি ছিল। না তিনি খুব লম্বা ছিলেন, আর না খুব বেঁটে। তিনি উজ্জ্বল গৌরবর্ণের ছিলেন। খুব বেশি ফর্সা বা গাঢ় বাদামি ছিলেন না। তাঁর মাথার চুল কিছুটা সোজা, খুব বেশি কোঁকড়ানো বা একেবারে সোজা ছিল না। তিনি (সা.) যখন নবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন সেই সময় তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। নবুয়তের পর দশ বছর মক্কায় এবং দশ বছর মদিনায় অবস্থান করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ষাট বছর। তাঁর মাথা ও দাড়িতে কুড়িটির বেশি সাদা পাকা চুল ছিল না।

(আল মুজেমুস সাগীর লি তিবরানী)

হযরত সাদ বিন হিশাম বিন আমির বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করি যে, রসুলে করীম (সা.)-এর আচার-আচরণ এবং উন্নত চরিত্র সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলুন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হুযুর (সা.)-এর স্বভাব-চরিত্র এবং জীবনযাপন পদ্ধতি কুরআন করীমের পূর্ণ অনুবর্তিতায় ছিল। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি কুরআন করীমে এই পড় নি- وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ অর্থাৎ হে রসূল! নিশ্চয় তুমি চরিত্রের মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রয়েছ।

(মসনদ আহমদ, পৃষ্ঠা: ৯, খণ্ড-৬)

হযরত জাবের বিন সামরা (রা.) বর্ণনা করেন: একরাতে আঁ হযরত (সা.) আমাদের মাঝে ছিলেন, যখন চাঁদ পূর্ণ যৌবনে ছিল। সেই সময় তিনি লাল ডোরাকাটা চাদর পরিহিত ছিলেন। সেই রাতে আমি একবার রসূলে করীম (সা.)-এর অনুপম সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করতাম আর একবার উজ্জ্বল চাঁদের দিকে। আমার কাছে আঁ হযরত (সা.) চাঁদের থেকে অনেক বেশি সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন।

(তিরমিযি, আবওয়াবুল আদাব)

সে এক রাজপুত্র এবং আধ্যাত্মিক বাদশাহদের নেতা, যার হাতে পৃথিবীর যাবতীয় ধন-ভাণ্ডারের চাবি দেওয়া হবে।

" যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, মুশরিকগণ অপবিত্র, নিকৃষ্টতম জীব, নির্বোধ, শয়তানের বংশধর এবং তাদের উপাস্য জাহান্নামের ইন্ধন ও অংশ তখন আবু তালেব আঁ হযরত (সা.)-কে ডেকে বলেন-

হে আমার ভাইপো! তোমার গাল-মন্দ শুনে জাতি বেজায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। খুব সম্ভব তারা তোমাকে ধ্বংস করে দিবে এবং তার সঙ্গে আমাকেও। তুমি তাদের জ্ঞানীজনদেরকে নির্বোধ আখ্যায়িত করেছ এবং তাদের সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গকে নিকৃষ্টতম জীব বলেছ। তাদের সম্মানীয় উপাস্যদেরকে জাহান্নামের আগুন ও ইন্ধন বলেছ। এবং সকলকে অপবিত্র এবং শয়তানের বংশধর বলেছ। আমি তোমার মঙ্গলের জন্য বলছি যে, নিজের ভাষাকে সংযত কর এবং গাল-মন্দ থেকে বিরত হও। নচেত আমি পুরো জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি রাখি না।

আঁ হযরত (সা.) উত্তরে বললেন- "হে চাচা! এটি গাল-মন্দ নয়। বরং এটি হল সত্য উদ্ঘাটন এবং যথোচিত বর্ণনা। এই কাজের জন্যই তো আমি প্রেরিত হয়েছি। এর কারণে যদি আমার মৃত্যুও আসে তথাপি আমি সানন্দে নিজের জন্য সেই মৃত্যুকে বরণ করব। আমার জীবন এই পথেই উৎসর্গিত। আমি মৃত্যু ভয়ে সত্য প্রকাশ থেকে বিরত হতে পারি না।

হে চাচা! যদি তুমি নিজের দুর্বলতা ও কষ্টের কথা চিন্তা কর তবে আমাকে আশ্রয় প্রদান করা থেকে নিরস্ত হও। খোদার কসম! আপনাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি খোদার আদেশ পৌঁছানোর কাজে কখনো থেমে থাকব না। খোদার আদেশ আমার প্রাণের চেয়ে বেশি প্রিয়। খোদার কসম! যদি আমি এই পথে মৃত্যু বরণ করি, তবে এই আকাঙ্খাই পোষণ করি যেন পুনরায় জীবিত হয়ে চিরকাল এই পথেই মৃত্যু বরণ করতে থাকি। এটিই ভীতির স্থল নয়। বরং তাঁর পথে দুঃখ সহন করার মধ্যে আমি অসীম আনন্দ খুঁজে পায়।

আঁ হযরত (সা.) এই বক্তব্য রাখছিলেন তখন তাঁর চেহারায় সত্য ও জ্যোতির আভা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হচ্ছিল। তাঁর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর সত্যের জ্যোতিঃ দেখে আবু তালেবের চোখ থেকে অশ্রুধারা বয়ে যেতে লাগল। তিনি বললেন- 'আমি তোমার এই মহান রূপ সম্পর্কে অবগত ছিলাম না। তুমি অসাধারণ গুণ ও নিদর্শনের আধার। যাও! নিজের কাজে মগ্ন হয়ে পড়। যতদিন পর্যন্ত আমি জীবিত আছি, যতদুর পর্যন্ত আমার শক্তি আছে, তোমার সঙ্গ দিব। (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন,৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১০)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

আবু তালেবের এই কাহিনীটি যদিও পুস্তকসমূহে লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু এই সমস্ত লেখনী ইলহামী যা খোদা তা'লা এই অধমের হৃদয়ে অবতীর্ণ করেছেন। কেবল কোন কোন বাক্য ব্যাখার জন্য এই অধমের পক্ষ থেকে লেখা হয়েছে। এই ইলহামী ভাষা থেকে আবু তালেবের সহানুভুতি এবং আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। কিন্তু সন্দেহাতীত ভাবে এবিষয়টি প্রমাণিত যে, এই সহানুভুতি জন্মেছিল নবুয়তের জ্যোতিঃ ও অবিচলতার লক্ষণ দেখেই। আমাদের সৈয়্যদ ও মৌলা (সা.) জীবনের একটি বড় অংশ, প্রায় চল্লিশ বছর, অসহায়ত্ব, অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে অনাথ হয়ে অতিবাহিত করেছিলেন। কোন আত্মীয় বা কাছের লোক সেই যুগে নির্জনে আত্মীয়তা বা নিকটতার দায়িত্ব পালন করে নি। এমনকি সেই আধ্যাত্মিক বাদশাকে নিজের শৈশবে লাওয়ারিস শিশুদের মত কিছু যাযাবর মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় আর এই অসহায় ও নিঃস্ব অবস্থায় এই সৈয়্যদুল আনাম নিজের দুদ্ধপানের দিনগুলি অতিবাহিত করেন। কিছুটা সাবালকত্বে উপনীত হলে অনাথ অসহায় বালকদের মত, যাদের পৃথিবীতে কেউ থাকে না,যাযাবরা সেই মাখদুমুল আলামীন (বিশ্ব-সেবক) কে বকরী চরানো কাজে লাগায়। সেই অনটনের দিনগুলিতে নিকৃষ্ট ধরণের শস্য বা ছাগলের দুধ ছাড়া তাঁর জন্য অন্য কোন খাবার ছিল না। যৌবনে উপনীত হলে তাঁর চাচা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা বিবাহের জন্য কোন বিন্দু মাত্র চিন্তা করেন নি, যদিও তিনি অসাধারণ সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। অবশেষে পঁচিশ বছর বয়সে দৈবক্রমে কেবল খোদার কৃপা ও অনুগ্রহে মক্কার এক ধনাঢ্য মহিলা আঁ হযরত (সা.) কে নিজে পছন্দ করে বিবাহ করেন। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, যে অবস্থায় আঁ হযরত (সা.)-এর নিজের চাচা আবু তালেব, হামযা এবং আব্বাস মজুদ ছিলেন এবং বিশেষ করে আবু তালিব মক্কার সর্দারও ছিলেন, তিনি জাগতিক ধন-সম্পদ, বৈভব, শক্তি ও প্রাচুর্যের অধিকারীও ছিলেন, কিন্তু তাদের এই প্রাচুর্য সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর সেই দিনগুলি বড়ই কষ্টে, অনাহারে এবং নিঃস্ব অবস্থায় কেটেছে। এমনকি যাযাবরদের ছাগল পর্যন্তও চরাতে হয়েছে। এমন যন্ত্রনাদায়ক অবস্থা দেখে কারো চোখে পানি আসে নি। আঁ হযরত (সা.) যখন পূর্ণ যৌবনে পৌঁছান, তখন কোন চাচার মনে এই চিন্তাটুকুও উঁকি দেয় নি যে, আমরাও তো তার পিতৃতুল্য, বিবাহের মত জরুরী বিষয়ে কিছুটা চিন্তা তো করি, যদিও তাদের পরিবারে বা আত্মীয়স্বজনদের ঘরেও মেয়ে ছিল। এখানে স্বভাতই প্রশ্ন ওঠে যে, এতটা নিস্তেজতা কেন প্রকাশ পেল? এর আসল উত্তর হল, তারা আমাদের প্রিয় নবী (সা.) কে দেখল যে, এক অনাথ বালক যার পিতা-মাতা কেউ নেই, একেবারেই সহায়-সম্বলহীন, যার কাছে কোন প্রকারের ধন-সম্পদ নেই। সম্পূর্ণ নিঃস্ব। এমন বিপন্ন মানুষের সহানুভুতি করে লাভ কি? একে জামাতা করার অর্থ হল নিজের মেয়েকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া। কিন্তু তারা একথা জানত না যে, সে এক রাজপুত্র এবং আধ্যাত্মিক বাদশাহদের নেতা, যার হাতে পৃথিবীর যাবতীয় ধন-ভাণ্ডারের চাবি দেওয়া হবে।"

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"প্রকৃত প্রশংসা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য, চোখ যার নাগাল পেতে পারে না। কিন্তু তিনি স্বয়ং চোখ পর্যন্ত পৌঁছান। তাঁর সম্পর্কে মানুষের বোধন থেকে কল্পনা এতটাই দূরে যতটা দিন থেকে রাত দূরে। সেই সত্তা যিনি কুরআন এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর মাধ্যমে শহর ও জঙ্গলের সমস্ত বাসিন্দাদের সার্বজনীনভাবে আহ্বান করেছেন। সালাম ও দরূদ বর্ষিত হোক খাতামান্নাবীঈন এবং নবীকুলের গর্ব তাঁর প্রিয় বান্দা মহম্মদ (সা.)-এর উপর, যিনি অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ নিয়ে এসেছেন, মানুষের সকল প্রয়োজন মিটিয়েছেন এবং সমগ্র জগতের সংশোধনের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অতএব, নিজেদের কামনা-বাসনাকে প্রদিক্ষণকারী অনেক মানুষ ছিল যারা আধ্যাত্মিক মানুষদের পরিমণ্ডলে প্রবেশ করেছে। আর কতই না বিজ্ঞ ভাষাবিদ ও প্রতাপশালী মানুষ ছিল যারা অত্যন্ত শিষ্ট ও পবিত্র হয়ে উঠল। হে আল্লাহ্! এই রসূল ও উম্মী নবীর উপর দরূদ প্রেরণ কর যিনি পরাকাষ্ঠায় সকল রসূলদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং যিনি নিজের জীবনধারা ও গুণাবলীতে প্রত্যেক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন এবং মানুষদের মনে অনুরাগ ও ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন যারা কপট ছিল, নিষ্ঠাবান ছিল না। আর এমন এক জাতির সংশোধন করলেন, যারা মুশরিক, ছিল, একেশ্বরবাদ ছিল না। তিনি এমন মানুষদেরকে পবিত্র করেছেন, যারা দুরাচারী ছিল, খোদাভীরু ছিল না। যারা নিজেদেরকে অলস হয়ে বসিয়ে রেখেছিল, তারা আল্লাহ্‌র পথে চলত না, তারা জেগে ছিল না। রসূলে করীম (সা.) উম্মী (নিরক্ষর) ছিলেন, যিনি ধর্মীয় বা জাগতিক কোন শিক্ষাই অর্জন করেন নি। তিনি এক এক নিরক্ষর ও অন্ধ জাতির মধ্যে লালিত পালিত হয়েছেন। তিনি কোন পণ্ডিত ও তত্ত্বজ্ঞানীদের চেহারা পর্যন্ত দেখেন নি, এমনকি তিনি কোন দিন বাড়ি থেকে বাইরে গেছেন আর না কখনও কোন বন্ধু ও প্রতিবেশীদের ছাড়া সফরে গেছেন। তাসত্ত্বেও তিনি সমস্ত আলেম এবং সমগ্র পৃথিবীর মানুষের থেকে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি, আশিস, কল্যাণ এবং (ঐশী) জ্যোতির ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছেন। এমনকি তাঁর হেদায়েতের পারদর্শিতা পুর্ব-পশ্চিম, আপন-পর সকলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং প্রত্যেক আঁচলধারী তাঁর আশিসের দিকে নিজেদের আঁচল প্রসারিত করেছে। তাঁর কল্যাণ ও আশিসের দিকে লোকেরা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অতএব তিনি মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তার দিকে পথপ্রদর্শন করেছেন এবং তাদেরকে ভেদাভেদ

এরপর ২৫-এর পাতায়...

এটি একটি গুরুতর অন্যায় ও অজ্ঞতাপূর্ণ অপবাদ যা জামাত আহমদীয়া উপর আরোপ করা হয়ে থাকে, যে নাউযি বিল্লাহ্ আমরা খাতামান নাবীঈনের আকিদার অস্বীকারকারী।

জামাত আহমদীয়া আদি থেকে শেষ পর্যন্ত এই ঘোষণা দিচ্ছে যে, এইসব নামধারী উলেমরা মিথ্যা বলছে । এবং এর সঙ্গে সত্যের দূরতম সম্পর্ক নেই।

আজকের এই জলসা যা সারা পৃথিবী দেখছে, এটিও আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের একটি নিদর্শন ও প্রমাণ। নতুবা উপায় উপকরণের দিকে দৃষ্টি দিলে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌঁছে দেওয়ার আমাদের জ্য অসম্ভব বলে প্রতীত হয়। অতএব এই প্রচারের কাজ খোদা তা'লা স্বয়ং করছেন আর টেলিভিশন এবং সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে খতমে নবুয়তের তাৎপর্য পৃথিবীর সামনে তুলে ধরাও তবলীগের একটি অংশ, কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই দায়িত্বের জন্য নিয়োজিত করেছেন আর এটিই আমাদের প্রিয় নবী (সা.)কে আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন যে, গোটা জগতে ইসলামের তবলীগ করতে হবে আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কেও এই একই আদেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান যুগে ইসলামের প্রসার ও প্রচারের জন্য আল্লাহ্ তা'লা যে সমস্ত উপায় উপকরণ দিয়েছেন সেগুলি মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগের সঙ্গেই সম্পৃক্ত।

অতএব এখানে আমাদের সকলের কর্তব্য হল তবলীগ করা এবং পৃথিবীকে অবগত করা যে খতমে নবুয়তের তাৎপর্য কি? ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা কি? এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর দাবী কি?

অতএব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে আল্লাহ্ তা'লা নিজের প্রিয়ভাজনের ধর্মকে পুনরায় পৃথিবীতে তার প্রকৃত রূপে বহাল করার ন্য এবং এর প্রচার ও প্রসারের জন্য পাঠিয়েছেন, যাকে আল্লাহ্ তা'লা পাঠিয়েছেন এবং এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, তিনি জয়যুক্ত হবেন, তার প্রসারকে জাগতিক সরকারের পক্ষ থেকে সৃষ্ট বাধাবিপত্তি এবং উলেমাদের অত্যাচার ও অপলাপ কিভাবে প্রতিহত করতে পারে?

আমরাই আঁ হযরত (সা.)-এর প্রাণদাস-এর শিক্ষানুসারে তাঁর মিশনকে অব্যাহত রেখে আজ পৃথিবীর ২১০টি দেশে খাতামানাবীঈনের পতাকা উত্তোলন করেছি।

এটি আমাদের ঈমান এবং এর উপর আমরা প্রতিষ্ঠিত যে, আঁ হযরত (সা.) খাতামান্নাবীঈন এবং কুরআন খাতামুল কিতাব এবং হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) হযরত মহম্মদ (সা.)-এর একনিষ্ঠ সেবক এবং তিনিই সেই মসীহ মওউদ এবং খাতামুল খুলেফা যাঁর আগমণের সংবাদ আঁ হযরত (সা.) দিয়েছিলেন এবং তাঁকে সালাম পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে ভালবাসার পন্থা এই মসীহ ও মাহদীর কাছ থেকে শিখেছি যার জামাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে নামধারী উলেমা আমাদেরকে কাফের বলে এবং ইসলামের গন্ডি থেকে বহিষ্কৃত করে।

আজ আহমদীয়াতের বিরোধীদের এই বিষয়গুলির কারণে এবং শত্রুদের শত্রুতার কারণে প্রত্যেক আহমদীর উপর পূর্বের তুলনায় বেশি দায়িত্ব অর্পিত হয়, তারা নিজেদের ঈমানগত এবং কর্মগত অবস্থার মধ্যে এমন পরিবর্তন আনে যা খোদা তা'লাকে আমাদের নিকটতর করে তোলে।

২০১৭ সালের জলসা সালনা কাদিয়ানে ৪৪টি দেশ থেকে ২০ হাজার ৪৮ জন অতিথি অংশ গ্রহণ করেন

জলসা সালনা কাদিয়ান ২০১৭ উপলক্ষ্যে, ৩১ শে ডিসেম্বর বায়তুল ফুতুহ লন্ডন থেকে হুযুর আনোয়ার কতৃক প্রদত্ত সমাপনী ভাষণ যা সরাসরি এম.টি.এর মাধ্যমে সম্প্রচারিত হয়

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

আহমদীয়াতের বিরোধীরা বর্তমানে এবং সর্বদাই নিজেদের ধারণায় একটি অপবাদ আরোপ করে আসছে এবং এটি এত বড় একটি অপবাদ যা তাদের মতে আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। বর্তমান শব্দটি আমি এই জন্য ব্যবহার করেছি যে, সর্বদাই এই আরোপ করা হয়ে থাকে, কিন্তু বর্তমানে এটি চরম রূপ ধারণ করেছে আর তা নাউযিবিল্লাহ জামাত আহমদীয়া নাকি খাতমে নবুয়তের আকিদাকে অস্বীকার করে। যদি তারা নিজেদের অপবাদকে সত্য বলে মনে করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা যা কিছু বলছে তা সঠিক, কিন্তু এটি অনেক বড় একটি মিথ্যা অপবাদ। এটি যখন একটি অপবাদ যার সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই, বরং আমরা তো সেই আকিদা পোষণ করি এবং আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যপ্রেমী ও ইমাম মাহদী (আ.) আমাদেরকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, যে-ব্যক্তি আঁ হযরত (সা.)কে খাতামান নাবীঈন বলে মানে না সে কাফের এবং ইসলামের গণ্ডি থেকে বাইরে। অতএব এটি একটি গুরুতর অন্যায় ও অজ্ঞতাপূর্ণ অপবাদ যা জামাত আহমদীয়া উপর আরোপ করা হয়ে থাকে, যে নাউযি বিল্লাহ্ আমরা খাতামান নাবীঈনের আকিদার অস্বীকারকারী। একদিকে আমরা নিজেদেরকে মুসলমান বলি আর অপরদিকে জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর নিজের কথা অনুসারে খাতমে নবুয়তের আকিদাকে না মেনে কাফের হয়ে যাব?

জামাত আহমদীয়া আদি থেকে শেষ পর্যন্ত এই ঘোষণা দিচ্ছে যে, এইসব নামধারী উলেমারা মিথ্যা

বলছে । এবং এর সঙ্গে সত্যের দূরতম সম্পর্ক নেই। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদেরকেতারা এত সন্ত্রস্ত করে রেখেছে যে, সাধারণত তারা এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে বা শোনার জন্য প্রস্তুত হয় না যে আহমদীরা কি বলছে? কিন্তু যারা এর উপর চিন্তাভাবনা করে, আমাদের কথা শোনে, কুরআন ও হাদীস বোঝে- তারা একথা বলতে বাধ্য হয় যে, প্রকৃতপক্ষে আহমদীরাই সঠিক মুসলমান এবং আঁ হযরত (সা.)-এর সত্য প্রেমিকে মসীহ মওউদ এবং ইমাম মাহদী বলে মেনেই হযরত মুহম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর প্রকৃত মর্যাদাকে সনাক্ত করা যেতে পারে।

ভারতীয় উপমহাদেশের ভারত ও পাকিস্তানের নামধারী উলেমাগণ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এবং নিজেদের অজ্ঞতাকে লুকোনোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে, যেন ঐ সব এলাকার মুসলমানদেরকে আহমদীদের ধারে কাছেও আসতে না দেওয়া যায়। অনুরূপভাবে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলিতেও তাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে যে, সেখানে যেন আহমদীয়াতকে বদনাম করে দেওয়া হয় এবং বর্তমানে তাদের পরিস্থিতি এরূপ যে, তারা অনেক দলকে আফ্রিকায় পাঠাতে আরম্ভ করেছে। সেখান থেকেও সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যে, তারা তাদেরকে প্রলোভন দেখাচ্ছে যে, তোমরা যদি আহমদীয়াত ছেড়ে দাও তাহলে আমরা তোমাদেরকে মসজিদ তৈরী করে দিব। আমরা তোমাদের সাহায্য করব। কিন্তু সেই সব মুসলমানরা যারা ইসলামের বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল তারা আহমদীয়াতের মাধ্যমেই সঠিক ইসলামকে চিনতে পেরেছে। নামায শিখেছে, কুরআন শিখেছে, তারাই তাদেরকে উত্তর দিচ্ছে এবং আল্লাহ্‌র তা'লার কৃপায় এই নতুন আহমদীরা এতটা মজবুত হয়ে গেছে যে, (তারা বলেন) এতদিন তোমাদের হুঁশ ছিল না। আজ যখন জামাত আহমদীয়া এসে আমাদেরকে কুরআন পড়িয়েছে আমাদেরকে নামায শিখিয়েছে, আমাদেরকে মসজিদ তৈরী করে দিয়েছে, আমাদের সন্তানদের তরবীয়ত করেছে, তাদেরকে কুরআন শিখিয়েছে এবং ধর্মের জ্ঞান প্রদান করেছে আর এখন তোমাদের জ্ঞান ফিরেছে? অতএব আমাদের কাছ থেকে চলে যাও। আমরা কখনোই তোমাদের কথা শোনার জন্য প্রস্তুত হব না। কিন্তু তারা চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু তাদেরকে স্মরণ রাখা উচিত যে, এইসব মানবীয় প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র খোদা তা'লার সামনে টিকতে পারবে না। এটি খোদা তা'লার নিয়তি যে, তিনি মসীহ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারীদেরকে সংখ্যা গরিষ্ঠে পরিণত করবেন। ইনশাআল্লাহ॥ অতএব এই দিক থেকে তো আহমদীদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, এরা আহমদীয়াতের উন্নতিকে কোনভাবেই আটকাতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে ইলহামের মাধ্যমে বলেছিলেন যে, ' আমি তোমাকে সম্মান প্রদান করব এবং বৃদ্ধি প্রদান করব।

(আসমানী ফায়সালা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৩৪২).

আর আমরা প্রতিনিয়ত এই দৃশ্য দেখছি যে, আহমদীয়াতের বিরোধীদের চরম বিরোধীতা সত্ত্বেও শত শত ও হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন আহমদীয়া মুসলিম জামাতে প্রবেশ করছিল, যদিও তারা এই অপবাদ রটিয়ে বেড়ায় যে, আহমদীরা ইসলামের মূল আকিদাসমূহের উপর ঈমান আনে না। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে বলেছিলেন যে, আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব।

(আল-হাকাম, ২য় খণ্ড, ২৭ শে মার্চ, ১৮৯৮)

এবং আমরা কিছু মানুষ সম্পর্কেই জানিই না যে, তারা কোথায় বসবাস করছে, কিন্তু তারা চেষ্টা প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে এবং জানায় যে, কিভাবে তারা আহমদীয়াতের বিষয়ে অবগত হয়েছে এবং এখন তারা জামাতের অন্তর্ভুক্ত হতে চায়। বর্তমান যুগের অগ্রগতিই এই প্রচারের মাধ্যম তৈরী করে দিয়েছে। এছাড়াও বিরোধীদের অনুচিত কার্যকলাপ, তাদের বক্তব্য, তাদের অন্যায় ও দুর্নীতি সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে আজকাল ছড়িয়ে পড়ছে। এবং তারা নিজেদের পরিবেশে আহমদীদের বিষয়ে কটু কথা বলে বেড়ায়। তাদের এই সব কথা শুনেই অনেক সৎ প্রকৃতির মানুষ আমাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। অতএব এটি আল্লাহ্ তা'লার কাজ যাকে মানুষের ষড়যন্ত্র কখনও প্রতিহত করতে পারবে না।

আজকের এই জলসা যা সারা পৃথিবী দেখছে, এটিও আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের একটি নিদর্শন ও প্রমাণ। নতুবা উপায় উপকরণের দিকে দৃষ্টি দিলে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌঁছে দেওয়া আমাদের জন্য অসম্ভব বলে প্রতীত হয়। অতএব এই প্রচারের কাজ খোদা তা'লা স্বয়ং করছেন আর টেলিভিশন এবং সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে খতমে নবুয়তের তাৎপর্য পৃথিবীর সামনে তুলে ধরাও তবলীগের একটি অংশ, কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই দায়িত্বের জন্য নিয়োজিত করেছেন আর এটিই আমাদের প্রিয় নবী (সা.)কে আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন যে, গোটা জগতে ইসলামের তবলীগ করতে হবে আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কেও এই একই আদেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান যুগে ইসলামের প্রসার ও প্রচারের জন্য আল্লাহ্ তা'লা যে সমস্ত উপায় উপকরণ দিয়েছেন সেগুলি মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগের সঙ্গেই সম্পৃক্ত।

অতএব এখানে আমাদের সকলের কর্তব্য হল তবলীগ করা এবং পৃথিবীকে অবগত করা যে খতমে নবুয়তের তাৎপর্য কি? ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা কি? এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর দাবী কি?

আজ আমি আঁ হযরত (সা.)-এর খাতামানাবীঈন হওয়া, এবং তাঁর সুমহান মর্যাদা সম্পর্কে হযরত মসীহে মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে কিছু বর্ণন করব। অনেক অ-আহমদী ভায়েরাও আমাদের প্রোগ্রাম দেখে। তাদের জন্য এই সব কথা পথ-প্রদর্শনের মাধ্যম হয়।

তিনি বলেন, " আমি পবিত্র কুরআনের সেই নির্দেশের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করি যে, যেখানে খোদা তা'লা মহানবী (সা.) কে খাতামাননাবীঈন বলে অভিহিত করেছেন সেখানে তাঁর শরিয়তকেও পরিপূর্ণতা দান করেছেন এবং اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ এর ঘোষণাও দিয়েছেন। ধর্মের পরিপূর্ণতাও হয়ে গেছে এবং পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে এবং খোদা তা'লার নিকট এখন শুধু ইসলামই হল মনোনীত ধর্ম এবং এখন খোদার রসূল (সা.)-এর নেক কর্মকে ত্যাগ করে অন্য কোন পথ অবলম্বন করা বিদা'ত।

তিনি নিজের বিরোধীদেরকে সম্বোধন করে বলেন যে, এখন বল যে, তোমরা যে এই স্বরচিত উপাসনা পদ্ধতি অবলম্বন করেছ এবং দরূদ এবং বাল্লেহ শাহের কয়েকটি শ্লোক যথেষ্ট মনে করা হয়েছে আর এটিকেই ধর্ম ধরে নেওয়া হয়েছে। কুরআন করীমের শিক্ষা বিস্মৃত হয়েছে। তাদের নামাযে কোন আনন্দ নেই এবং নামাজের আনন্দ অর্জন করার পরিবর্তে স্বরচিত 'আযকারে' আত্মমগ্ন হয়ে পড়ে এবং পাগড়ি খুলে ফেলে দেয়। নাচতে গাইতে শুরু করে। হৈ-হুল্লোড় শুরু করে দেয়। তিনি বলেন, আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে এমন ধরণের কাজ হত কি? আর এই কথাগুলি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগেরই কথা নয়। বর্তমান যুগেও মুসলমানদের মধ্যে এ ধরণের মেহেফিল হয়ে থাকে। ভাংড়া নাচ হয়ে থাকে। আজকাল তো সোশাল মিডিয়ায় তাদের এই সব কার্যকলাপ সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা বিচিত্র সব বেশভুষা ধারণ করে থাকে। যাইহোক তিনি বলেন, তোমরা আমার উপর অভিযোগ আরোপ কর যে, আমি নবুয়তের দাবি করেছি এবং খাতমে নবুয়তের মোহর ভঙ্গ করেছি, যেন আমি কোন স্বতন্ত্র নবুয়তের দাবি করেছি। তিনি বলেন, আমার দাবি হল আঁ হযরত (সা.)-এর দাসত্বে তাঁর শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং প্রতিষ্ঠিত করানো। কিন্তু তোমরা নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখ না যে, মিথ্যা নবুয়ত তো তোমরা রচনা করে রেখেছ আর রসুল এবং কুরআন বিরুদ্ধ নিত্য নতুন পন্থার উদ্ভাবন করছ । যদি ন্যায়পরায়ণতা থেকে থাকে তবে বল, আমি কি রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র শিক্ষা এবং কর্মবিধিতে থেকে কিছুমাত্রও সংযোজন বা বিয়োজন করেছি? তিনি বলেন, আররা যিকর পদ্ধতির কথা আমি বলেছি না কি তোমাদের উদ্ভাবন?

আর অনুরূপে কেবল 'আল্লাহ্ হু'র মেহফিল বসে। নামায এবং দোয়ার প্রতি কোন মনোযোগ নেই। জানি না আরও কত কিছু প্রথা ও রীতি রেওয়াজ এবং বিদাত তৈরী করেছে। পীর-ফকিরদের কবরে গিয়ে তারা সিজদা করে। ইসলাম ধর্মে এই ধরণের বিদাতের অনুপ্রবেশ করিয়েছে তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। তিনি বলেন, অতএব, তোমরা আমার উপর এই অভিযোগ আরোপ করো না, বরং নিজেদের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত কর।'

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৮-৯০, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

আঁ হযরত (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

" নিশ্চয় স্মরণ রেখ! আঁ হযরত (সা.) কে খাতামান নাবীঈন বলে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি সঠিক মুসলমান হতে পারে না এবং তাঁর আনুগত্যকারী হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই সমস্ত নিত্য নুতন রীতি রেওয়াজ (অর্থাৎ ধর্মের মধ্যে যে সব নতুন বিদাত সৃষ্টি করেছে) থেকে বিরত থাকবে এবং নিজের কথা ও কর্মের মাধ্যমে তাঁকে খাতামান নাবীঈন বলে বিশ্বাস করবে, এর কোন মূল্য নেই। তিনি বলেন, দেখ, সাদি খুব সুন্দর বলেছেন-

'তোমরা তাকওয়া এবং সততা অর্জনের জন্য অবশ্যই চেষ্টা কর কিন্তু নবী করীম (সা.)-এর নির্ধারিত শিক্ষাকে লঙ্ঘন করো না।

তিনি বলেন, আমার আগমণের একমাত্র উদ্দেশ্য হল নবী করীম (সা.)-এর সম্মান ও নবুয়তকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। তিনি বলেন, আমার উদ্দেশ্য যার জন্য খোদা তা'লা আমার মনের মধ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন, তা হল এই যে, যেন কেবল রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নবুয়ত প্রতিষ্ঠিত করা হয় যা খোদা তা'লা চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং সেইসব মিথ্যা নবুয়তকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া যা এরা নিজেদের বিদাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। সেই সব পদবির দিকে একবার তাকিয়ে দেখ (অর্থাৎ পির-ফকিরদে পদবি) এবং কর্মের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখ যে, নবী করীম (সা.)-এর খাতমে নবুয়তের উপর আমরা ঈমান রাখি না কি তারা?

এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন,

" খাতমে নবুয়তের কেবল মৌখিক স্বীকারুক্তিকেই নবুয়তের বিষয়ে খোদা তা'লার অভিপ্রায় বলে প্রকাশ করা এবং নিজেদের পছন্দ মত কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া ও নিজেদের এক পৃথক শরীয়ত বানিয়ে নেওয়া ঘোর অন্যায় ও ধৃষ্টতার পরিচায়ক।" অ-আহমদীরা বিভিন্ন ধরণের বিদাত তৈরী করে রেখেছে। "বাগদাদী নামায,মাকুস নামায ইত্যাদি উদ্ভাবন করেছে। কুরআন করীম বা নবী করীম (সা.)-এর কর্মবিধি থেকে কোথাও এর সন্ধান পাওয়া যায়? অনুরূপভাবে 'ইয়া শেখ আব্দুল কাদের জিলানী শাইয়ান লিল্লাহি' উচ্চারণ করা- এর প্রমাণও কুরআন শরীফে কোথাও পাওয়া যায়? আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে তো শেখ আব্দুল কাদের জিলানীর অস্তিত্বও ছিল না। তবে এসব কে বলেছে? তিনি বলেন, "লজ্জা কর! ইসলামী শরীয়তকে মান্য করা এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা কি এর নাম? " তিনি বলেন, " এখন নিজেই বিচার করুন যে, এই সমস্ত কথা মেনে এবং আমল করে তোমরা কি এর যোগ্য রয়েছ যে আমাকে খাতমে নবুয়তের মোহর ভঙ্গ করার অপবাদে অভিযুক্ত করতে পার? সত্য এই যে, তোমরা যদি নিজেদের মসজিদে বিদাতকে প্রবেশ করতে না দিতে এবং খাতামানাবীঈন (সা.)-এর প্রকৃত নবুয়তের উপর ঈমান এনে তাঁর কর্মপন্থা এবং পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে তবে আমার আগমণের প্রয়োজনই বা কি ছিল? তিনি বলেন, ' তোমাদের এই বিদাত এবং নতুন নবুয়তই আল্লাহ্ তা'লার আত্মমর্যাদাভিমানকে রসূল করীম (সা.)-এর বেশে এক ব্যক্তিকে আবির্ভূত করার জন্য উস্কে দিয়েছে, যিনি এসে এই সমস্ত মিথ্যা নবুয়তের প্রতিমাকে ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। অতএব সেই কাজের জন্যই খোদা তা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন।" তিনি বলেন, 'গদ্দিনশীনদেরকে সিজদা করা বা তাদের গৃহ প্রদক্ষিণ করা তো খুবই সাধারণ বিষয়।'

তিনি নিজের আবির্ভাব ও জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এবং খাতমে নবুয়তের তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

" আল্লাহ্ তা'লা জামাতকে এই কারণেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন যেন তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর নবুয়ত এবং সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এক ব্যক্তি যে কারো প্রেমিক বলে পরিচিত, যদি তার মত আরও হাজার হাজার থাকে, তবে তার ভালবাসার বিশেষত্ব কি থাকল? এরা যদি রসূল করীম (সা.)-এর ভালবাসায় আত্মবিলীন থাকে, যেমনটি এরা দাবি করে, তবে কেন তারা হাজার হাজার মাজারের পুজো করে? একদিকে বলে, আমরা আঁ হযরত (সা.)-এর ভালবাসায় বিলীন রয়েছি আর অপরদিকে মাজারে কেবল দোয়ার জন্য যায় না, বরং সেখানে পূজা করে, সিজদা করে। তিনি বলেন, " পবিত্র মদীনায় যায় ঠিকই" হজ্জ ও উমরার জন্য যায় এবং দোয়া করে, "কিন্তু আজমের এবং অন্যান্য মাজারে খালি মাথায় এবং খালি পায়ে যায়।" এগুলিকেও সেই মর্যদা দিয়ে রেখেছে। 'পাকপতন-এর জানালা দিয়ে অতিক্রম করাকেই নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করে তারা।" এখানেও তারা বিদাত উদ্ভাবন করেছে। সেখানে বুযুর্গ-এর জানালা এবং দরজা অতিক্রম করতে পারলে নাজাত লাভ হবে। তিনি বলেন, " কেউ কোন পতাকা উঁচিয়ে রেখেছে, কেউ আবার অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করেছে। মানুষের মেলা এবং উরুস দেখে একজন প্রকৃত মুসলমানের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে যে, এসব কি? " তিনি বলেন, " যদি ইসলামের বিষয়ে খোদা তা'লার আত্মযাদাভিমান না থাকত এবং إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (আলে ইমরান: ২০) খোদার এই বাণী না থাকত এবং তিনি إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ এই ঘোষণা না দিতেন, তবে ইসলামের আজ এমন করুণ দশা হয়েছে যে, এর মুছে যাওয়ার বিষয়ে কোন সংশয় থাকত না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার আত্মমর্যাদাভিমান উদ্বেলিত হয়েছে আর তাঁর করুণা এবং রক্ষার প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবি হল রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতিরূপকে পুনরায় নাযেল করা এবং এই যুগে তাঁর নবুয়তকে পুনর্জীবিত করে দেখানো। এই উদ্দেশ্যেই তিনি এই সেলসেলার গোড়া পত্তন করেছেন এবং আমাকে প্রত্যাদিষ্ট ও মাহদী করে পাঠিয়েছেন।"

অতএব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে আল্লাহ্ তা'লা নিজের প্রিয়ভাজনের ধর্মকে পুনরায় পৃথিবীতে তার প্রকৃত রূপে বহাল করার জন্য এবং এর প্রচার ও প্রসারের জন্য পাঠিয়েছেন, যাকে আল্লাহ্ তা'লা পাঠিয়েছেন এবং এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, তিনি জয়যুক্ত হবেন, তার প্রসারকে জাগতিক সরকারের পক্ষ থেকে সৃষ্ট বাধাবিপত্তি এবং উলেমাদের অত্যাচার ও অপলাপ কিভাবে প্রতিহত করতে পারে?

আমরাই আঁ হযরত (সা.)-এর প্রাণদাস-এর শিক্ষানুসারে তাঁর মিশনকে অব্যাহত রেখে আজ পৃথিবীর ২১০টি দেশে খাতামানাবীঈনের পতাকা উত্তোলন করেছি।

এই সিলসিলাকে আল্লাহ্ কোন উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন? এবিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

" আজ দুই প্রকারের শিরকের উদ্ভব ঘটেছে যা ইসলাম নিমূল করার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখে নি। যদি খোদার কৃপা না হত, তবে তাঁর প্রিয় ও মনোনীত ধর্মের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত মুছে যাওয়ার যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (আল হিজর: ১০) এই রক্ষার প্রতিশ্রুতির দাবি ছিল, নৈরাজ্যপূর্ণ সময়ে তিনি তাদেরকে উদ্ধার করবেন। তিনি বলেন, " চৌকিদারের কাজ হল, অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করা এবং অন্যান্য কাজে অপরাধীদের দেখে নিজেদের পদের দায়িত্ব পালন করা। অনুরূপভাবে আজ যেহেতু অনেক অরাজকতা সৃষ্টি পুঞ্জীভুত হয়েছিল" এবং ইসলামের দূর্গে সকল প্রকারে বিরোধীরা হাতিয়ার উঁচিয়ে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়েছিল, এই কারণে খোদা তা'লা চান নবুয়তের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করতে। ইসলাম বিরোধীতার এই উপাদান বস্তুতঃ দীর্ঘকাল যাবৎ পুঞ্জীভুত হয়ে আসছিল আর এখন ফুটে বেরিয়েছে। যেমন প্রারম্ভে শুক্রাণু থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পরে সন্তান হিসেবে ভূমিষ্ঠ

হয়। অনুরূপভাবে ইসলামের বিরোধীতার শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে। আর এখন সে সাবালক হয়ে পূর্ণ উদ্যম ও শক্তিতে পরিপূর্ণ রয়েছে।" এই সবই আমরা আজকাল লক্ষ্য করছি যে, পৃথিবীর সর্বত্র সংসারাসক্ত মানুষেরাও ইসলামের বিরোধীতা করছে। তাদের উদ্দেশ্য হল, ভূ-রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করা, কিন্তু ইসলামকে বদনাম করে তারা শক্তি অর্জন করতে চাই। ইসলামী দেশসমূহের সম্পদ অর্জন করার জন্যও অর্থাৎ ধর্মীয় এবং জাগতিক উভয় দিক থেকেই বর্তমানে মুসলমানদেরকে লক্ষ্য বানানো হচ্ছে। তিনি বলেন, পূর্ণ শক্তি ও উদ্যমে বর্তমানে এই বিরোধিতা হচ্ছে। " এই কারণে এটিকে নির্মূল করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা ঊর্দ্ধলোকে এক পরিকল্পনা করেছেন এবং এই অপছন্দনীয় শিরককে যা অভ্যন্তরীন এবং বাহ্যিকভাবে তৈরী করা হয়েছিল দূর করার জন্য এবং খোদা তা'লার একত্ববাদ ও প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই সেলসেলা স্থাপন করেছেন।" কবর পূজার কারণে অভ্যন্তরীণভাবেও মুসলমানদের মধ্যে এক প্রকারের শিরকের উদ্ভব হয়েছে এবং বাহ্যিকভাবেও মানুষ আল্লাহ্ তা'লার বিশ্বাস আনতে অস্বীকার করছে আর শিরক তো এমনিতেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ সংসারাসক্তির শিরকে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। এই কারণে তিনি বলেন, এই যাবতীয় প্রকারের শিরক দূর করার জন্য খোদা তা'লা এই সিলসিলা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বলেন, " এই সিলসিলা খোদার পক্ষ থেকে এবং জোরালো দাবি এবং অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে বলছি যে, এটি খোদার পক্ষ থেকে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি স্বহস্তে এর ভিত রচনা করেছেন। যেমনটি তিনি নিজের সাহায্য ও সমর্থন দ্বারা দেখিয়েছেন যা এই সিলসিলার জন্য তিনি প্রকাশ করেছেন।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯০-৯৩, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

অতঃপর তিনি এই বিষয়টিকে আরও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আগমণকারীরা দুই প্রকারের হয়ে থাকেন। এক প্রকার হল শরীয়ত আনয়নকারী এবং দ্বিতীয় প্রকার হলেন তারা যারা শরীয়তধারীর কাজকে অব্যাহত রাখার জন্য খোদার পক্ষ থেকে যারা আসেন। এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

"খোদা (তা'লা)র পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে আগমণকারীদের দুইটি শ্রেণী রয়েছে। এক প্রকার হলেন শরীয়তধারী। যেমন-মূসা (আ.)। আরেক প্রকার হলেন যারা শরীয়তের পুনরুত্থানের জন্য আসেন। যেমন হযরত ঈসা (আ.) অনুরূপভাবে আমাদের ঈমান হল এই যে, আমাদের নবী করীম (সা.) পূর্ণ শরীয়ত সহকারে আবির্ভুত হন, যিনি নবুয়তের 'খাতাম' ছিলেন।.....অতএব হুযুর (সা.)-এর পর আমরা অন্য কোন শরীয়তের আগমণের বিষয়ে মোটেই বিশ্বাসী নই। তবে যেমন আমাদের খোদার পয়গাম্বর (সা.) হযরত মূসার প্রতিরূপ ছিলেন। অনুরূপভবে তাঁর (সা.) সেলসেলার 'খাতাম' যিনি খাতামুল খুলেফা অর্থাৎ মসীহ মওউদ, তাঁর জন্য হযরত মসীহ্ (আ.)-এর প্রতিরূপ হয়ে আসা আবশ্যক ছিল। অতএব আমিই সেই খাতামুল খোলেফা এবং প্রতিশ্রুত মসীহ। যেরূপে মসীহ কোন শরীয়ত নিয়ে আসেন নি বরং মূসার শরীয়তকে পুনর্জীবিত করতে এসেছিলেন। তদ্রূপে আমিও কোন নতুন শরীয়ত নিয়ে আসি নি। আর কুরআন করীমের পর এখন কোন শরীয়ত আসতে পারে, এমন কথা আমি কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারি না। কেননা, এটি পূর্ণাঙ্গীন শরীয়ত এবং খাতামুল কিতাব। অনরূপভাবে খোদা তা'লা আমাকে মহম্মদী শরীয়তকে পুনর্জীবিত করার উদ্দেশ্যে এই শতাব্দীতে খাতামুল খোলেফা নামে আবির্ভুত করেছেন। আমার ইলহাম সমূহ, যা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আমার উপর অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং সর্বদা যা লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে প্রকাশ করা হয়ে থাকে সেগুলি বিফল হয় না, আর না বিফল হবে এবং সেগুলি প্রতিষ্ঠিত থাকবে। "

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা:২৭২, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

অতঃপর তিনি জোরালো ভাষায় একথাও বর্ণনা করেছেন যে, আমি যা কিছু পেয়েছি তা আঁ হযরত (সা.)-এর কল্যাণেই পেয়েছি। এবিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

" আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমার মনের মূল আবেগ হল যাবতীয় প্রশংনীয় গুণাবলী এবং সুন্দর বৈশিষ্টাবলী আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি সমর্পিত করি। আমার যাবতীয় আশা-আকাঙ্খা এবং আগমণের উদ্দেশ্য খোদা তা'লার একত্ববাদ এবং রসূলে করীম (সা.)-এর সম্মান প্রতিষ্ঠার মধ্যে নিহিত। আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার সম্পর্কে যে সমস্ত প্রশংসা ও সম্মানসূচক বাক্যাবলী বর্ণনা করেছেন, সেগুলি সবই আঁ হযরত (সা.)-এর জন্য বলা হয়েছে ।"

অর্থাৎ তাঁরই দিকে আরোপিত হয়েছে। তাঁরই অনুগ্রহে ও কল্যাণে। তিনি বলেন, " এই কারণে যে, আমি তাঁরই প্রাণদাস এবং তাঁরই নবুয়তের প্রদীপে জ্যোতিঃ লাভ করেছি। স্বতন্ত্রভাবে আমার কিছুই নেই। এই কারণেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি কোন ব্যক্তি আঁ হযরত (সা.)-এর পর দাবি করে যে, আমি স্বাধীনভাবে আঁ হযরত (সা.)-এর কল্যাণ ছাড়াই প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি এবং খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক রাখি তবে সে মৃত এবং জড়। খোদা তা'লার চিরন্তন মোহর এবিষয়ের উপর নির্ধারিত হয়ে গেছে যে, কোন ব্যক্তি আঁ হযরত (সা.)-এর অনুবর্তিতা ব্যাতিরেকে আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাতের দরজা দিয়ে আসতে পারবে না।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা:২৮৭, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

আল্লাহ্ তা'লার দিকে যেতে হলে এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে হলে একটিই দরজা রয়েছে এবং সেই দরজা হল আঁ হযরত (সা.)-এর সত্ত্বা।

অতএব এটি আমাদের বিশ্বাসের অঙ্গ যে, আঁ হযরত (সা.) খাতামুল আম্বিয়া এবং কুরআন করীম খাতামুল কিতাব। আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নতুন কোন শরীয়ত নিয়ে আসেন নি, আর না এখন কোন নতুন শরীয়ত আসতে পারে। আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদার দাবি অনুসারে খোদা তা'লা আঁ হযরত (সা.)-এর অনুবর্তিতার কারণে আগমণকারী মসীহ মওউদ ও মাহদীকে নবীর মর্যাদায় ভুষিত করেছেন। শরীয়তধারী নবীর দাসত্বের কারণে, কোন নবীর দাসত্বের কারণে নবীর মর্যাদা লাভ হয়েছে, অন্য আর কোন নবীর এমন মর্যাদা লাভ হয় নি। অতএব এটি আমাদের ঈমান এবং এর উপর আমরা প্রতিষ্ঠিত যে, আঁ হযরত (সা.) খাতামান্নাবীঈন এবং কুরআন খাতামুল কিতাব এবং হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) হযরত মহম্মদ (সা.)-এর একনিষ্ঠ সেবক এবং তিনিই সেই মসীহ মওউদ এবং খাতামুল খুলেফা যাঁর আগমণের সংবাদ আঁ হযরত (সা.) দিয়েছিলেন এবং তাঁকে সালাম পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

(আল মু'জেমুল আওসাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৩-৩৮৪, হাদীস নং ৪৮৯৮)

যে আহমদী হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মর্যাদা এর থেকে বেশি মনে করে, নিশ্চয় সে মুসলমান নয়। যেরূপ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, অন্যান্য মুসলমানেরা এবং সরকার আমরা খতমে নবুয়তের উপর বিশ্বাস রাখি না এবং হযরত মহম্মদ (সা.)কে শেষ নবী মানে বলে আমাদের উপর ফতোয়া লাগাতে চাইলে লাগাক এবং আহমদীদের উপর উৎপীড়ন চালাতে এবং হত্যা করতে মুসলিম জনসাধারণকে যত খুশি উসকানি দিক, কিন্তু আমাদেরকে ঈমান থেকে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা কখনওই বিচ্যুত করতে পারবে না, কেননা, আমরা সেই সব কিছু পেয়েছি যা হযরত রসূলে করীম (সা.) আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেছিলেন। আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে ভালবাসার পন্থা এই মসীহ ও মাহদীর কাছ থেকে শিখেছি যার জামাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে নামধারী উলেমা আমাদেরকে কাফের বলে এবং ইসলামের গন্ডি থেকে বহিষ্কৃত করে।

আজ আহমদীয়াতের বিরোধীদের এই বিষয়গুলির কারণে এবং শত্রুদের শত্রুতার কারণে প্রত্যেক আহমদীর উপর পূর্বের তুলনায় বেশি দায়িত্ব অর্পিত হয়, তারা নিজেদের ঈমানগত এবং কর্মগত অবস্থার মধ্যে এমন পরিবর্তন আনে যা খোদা তা'লাকে আমাদের নিকটতর করে তোলে।

যেরূপ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, এই জাগতিক বিরোধীতা আমাদের কোন ক্ষতিই সাধন করতে পারবে না, যাদ আরশে'র খোদার সঙ্গে আমাদের দৃঢ় সম্পর্ক থাকে। (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ১৫) অতএব আমাদেরকে আরশের খোদার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করার চেষ্টা করতে হবে। নিশ্চয় সেই দিন সমাগত যেদিন সমস্ত বিরোধীতা উধাও হয়ে যাবে যখন বিরোধীরা মুখ থুবড়ে পড়বে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ হবে। কিন্তু আমি যেরূপ বলেছি, তার জন্য আমাদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের ঈমান ও কর্মবিধিকে কোন মানে উপনীত দেখতে চান, সে সম্পর্কে তিনি এক স্থানে বলেন:

" হে বন্ধুরা যারা আমার বয়াতের অন্তর্ভুক্ত! খোদা আমাকে এবং তোমাদের সকলকে সেই সমস্ত বিষয়ের তৌফিক দান করুন যার উপর তিনি প্রীত হন। আজ তোমরা সংখ্যায় কম এবং তোমাদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে এবং তোমাদের জন্য এটি পরীক্ষার সময়। আল্লাহ্ তা'লার এই চিরাচরিত রীতি অনুসারেই চতুর্দিক থেকে চেষ্টা করা হবে যাতে তুমি হোঁচট খাও। আর সকল উপায়ে তোমাদেরকে কষ্ট দেওয়া হবে এবং বিভিন্ন প্রকারের কথা তোমাদেরকে শুনতে হবে। আর প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে তোমাকে কথা বা হাতের মাধ্যমে কষ্ট দিবে, সে ধারণা করবে যেন সে ইসলামের সমর্থন করছে। আর কিছু ঐশী পরীক্ষারও তোমরা সম্মুখীন হবে, যাতে তোমাদের সব দিক থেকে পরীক্ষা করে নেওয়া হয়। অতএব তোমরা এখন শুনে রেখ, ডাহা যুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করে বা ঠাট্টার পরিবর্তে ঠাট্টা করে বা গালির পরিবর্তে গালি দেওয়া তোমাদের বিজয়ের পথ নয়। কেননা, তোমরা এই পথই অবলম্বন কর, তবে তোমাদের হৃদয় পাষান হয়ে যাবে এবং তোমাদের হাতে থাকবে কেবল কথার সমাহার যা খোদা তা'লা তীব্র ঘৃণা ও বিরাগের দৃষ্টিতে দেখেন। অতএব এমন যেন না হয় যে তোমরা নিজেদের উপর দুটি অভিসম্পাতকে একত্রিত কর। একটি মানুষের এবং অপরটি খোদারও।"

তিনি বলেন: নিশ্চয় স্মরণ রেখ! মানুষের অভিসম্পাতের সঙ্গে যদি খোদার অভিসম্পাত সংযুক্ত না হয় তবে তা কোন গুরুত্ব রাখে না। খোদা তা'লা যদি আমাদেরকে ধ্বংস করতে না চান তবে আমাদের ধ্বংস কারো হাতে নেই। কিন্তু তিনিই যদি আমাদের শত্রু হয়ে যান তবে কেউ আমাদেরকে আশ্রয় দিতে পারে না।' তিনি বলেন, " আমরা কিভাবে খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করব এবং তিনি কিভাবে আমাদের সঙ্গে থাকবেন? তিনি আমাকে এই প্রশ্নের বারংবার এই উত্তরই দিয়েছেন যে, তাকওয়ার মাধ্যমে। " অতএব তাকওয়া সৃষ্টি করা এবং তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করা আবশ্যক। আর তাকওয়া হল প্রত্যেক পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতি করার চেষ্টা করা।

তিনি বলেন: " অতএব, হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা! মুত্তাকি হওয়ার চেষ্টা কর। কর্ম ছাড়া সব কিছু তুচ্ছ এবং নিষ্ঠা ছাড়া কোন কাজ গৃহীত হয় না। অতএব তাকওয়া হল, সেই সমস্ত ক্ষতি এড়িয়ে খোদা তা'লার পথে অগ্রসর হওয়া এবং সত্যের সূক্ষ্ম পথ সম্পর্কে সজাগ থাকা। সর্ব প্রথম নিজেদের অন্তরে বিনয় এবং, পবিত্রতা এবং নিষ্ঠা তৈরী কর। প্রকৃতই কোমল হৃদয়, আত্মনিবেদনকারী ও নিরীহ হয়ে যাও। " অন্তরে কোমলতা সৃষ্টি কর। তিনি বলেন, " যদি তোমার হৃদয় অনিষ্ট-শূন্য হয় এবং তোমার জিহ্বাও অনিষ্টশূন্য হবে এবং অনুরূপে তোমার চক্ষুদ্বয় এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গও। সমস্ত আলো বা অন্ধকার প্রথমে হৃদয়ে সৃষ্টি হয় এবং ক্রমশঃ তা সমগ্র শরীরে ছেয়ে যায়। তিনি বলেন, " নিজেদের অন্তরকে সবসময় হাঁতড়াতে থাক। যেরূপে পান চর্বনকারী পানকে মুখের মধ্যে ঘোরাতে থাকে এবং অকেজো টুকরোগুলিকে কেটে বাইরে নিক্ষেপ করে। অনুরূপভাবে তোমরাও নিজেদের অন্তরে গোপন চিন্তাধারা, অভ্যাস, রীতি ও আবেগকে চোখের সামনে নিজের চোখের সামনে নিয়ে এস। এবং যে অভ্যাস বা রীতিকে অকেজো বলে মনে হয় সেগুলিকে কর্তন করে বাইরে নিক্ষেপ কর। পাছে এগুলি তোমাদের পুরো অন্তরকেই অপবিত্র করে তোলে এবং তোমাকে কর্তন করা হয়। অতঃপর চেষ্টা কর এবং খোদা তা'লার কাছে শক্তি ও সাহস যাচনা কর, যাতে হৃদয়ে পবিত্র সংকল্প, পবিত্র চিন্তাধারা এবং পবিত্র আবেগ ও স্পৃহা এবং পবিত্র আশা-আকাঙ্খা তোমাদের যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং শক্তিবৃত্তির মাধ্যমে উন্মোচিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করে। " অর্থাৎ কর্মগত দিক থেকেও এটি প্রকাশিত হওয়া দরকার। " যাতে তোমাদের পুণ্যকর্ম পরম উৎকর্ষে পৌছায়, কেননা অন্তর নিঃসৃত কথা যদি অন্তরেই নিহিত থাকে তবে তা তোমাদেরকে কোন মর্যাদাতেই পৌছাতে পারে না।" তিনি আরও বলেন: নিজেদের অন্তরে খোদা তা'লার শ্রেষ্ঠত্বকে স্থান দাও এবং তাঁর প্রতাপকে দৃষ্টির সামনে রেখে স্মরণ কর যে, কুরআন করীমে পাঁচশ-র কাছাকাছি বিধিনিষেধ রয়েছে এবং তা তোমাদের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শক্তিবৃত্তি, প্রত্যেক অবস্থা, প্রত্যেক বয়স, বিবেক, স্বভাব, আচার-আচরণ এবং ব্যক্তিপর্যায় ও সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এক জ্যোতির প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। " অতএব বিবেক-বুদ্ধি, স্বভাব-চরিত্র, খোদার সঙ্গে সম্পর্ক অনুসারে এবং ব্যক্তিপর্যায় এবং সামগ্রিকভাবেও আল্লাহ্ তা'লা এক আহ্বান করেছেন। এটিকে প্রত্যেক আহমদীর বোঝা আবশ্যক। এর জন্য যেখানে জ্ঞানার্জন করতে হবে, তেমনি এটিকে বাস্তবায়িতও করতে হবে। তিনি বলেন, " অতএব তোমরা এই আহ্বানকে কৃতজ্ঞতাপূর্বক স্বীকার কর এবং যতটুকু খাদ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তা সবটুকু গ্রহণ কর এবং উপকৃত হও। যে ব্যক্তি এই সমস্ত আদেশাবলীর মধ্যে একটিকেও অমান্য করে, আমি সত্য সত্য বলছি, সে আদালতের দিন ধৃত হওয়ার যোগ্য হবে। যদি নাজাত লাভ করতে চাও তবে সঠিক ধর্ম অবলম্বন কর এবং কপর্দকশূন্য হয়ে কুরআন করীমের জোয়াল কাঁধে তোল, কেননা, দুষ্টরা ধ্বংস হবে এবং অবাধ্যরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। যে নীরিহ হয়ে নিজের মাথা নোওয়ায় সে মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবে। জাগতিক সমৃদ্ধির শর্তে খোদা তা'লার ইবাদত করো না।" জাগতিক কামনা-বাসনা পূর্ণ করার শর্ত নিজেদের ইবাদতের উপর আরোপ করো না। কেননা, এভাবে এটি আর ইবাদত থাকে না। তিনি বলেন, " যদি তোমরা জাগতিক শর্ত আরোপ কর, তবে এমন চিন্তাধারার জন্য (ধ্বংসের) গহ্বর অপেক্ষা করে আছে। বরং তোমরা এই কারণে তাঁর ইবাদত কর যেন তোমাদের উপর স্রষ্টার ইবাদতের এক অধিকার রয়েছে। ইবাদতই যেন তোমাদের জীবন হয় এবং তোমাদের পুণ্যকর্মের উদ্দেশ্য কেবল যেন এতটুকু হয় যে, সেই প্রকৃত প্রেমাস্পদ এবং পরম হিতৈষী সন্তুষ্ট হন। কেননা, এরচেয়ে নিম্নমানের চিন্তাধারায় হোঁচট খাওয়ার আশঙ্কা থাকে।"

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা; ৫৪৬-৫৪৮)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সমস্ত বিষয়ের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। প্রতিদিন আমাদের পদক্ষেপ যেন পুণ্যের দিকে অগ্রসর হয়। পাকিস্তানের আহমদীদেরকেও বিশেষভাবে দোয়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। এবং দোয়ায় নিজেদের অবস্থার প্রতি মনোযোগ দিয়ে তাদেরকে বেশি মাত্রায় খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত। সেখানে খুব বেশি মাত্রায় আহমদীদের উপর কঠোরতা করা হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিদিন নিত্যনতুন আইন পাশ করা হচ্ছে এবং তৈরী করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে নিজের নিরপত্তার

এরপর ২৩এর পাতায়

মহানবী (সা.)-এর বহুবিবাহ এবং এর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা

মূল উর্দূ : সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা: মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. (রা.)

হযরত আয়েশার বিবাহের সঙ্গেই মহানবী (সা.)-এর জীবনে বহুবিবাহের সূত্রপাত ঘটে। তাই এখানে এই বিষয়টি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা সমীচিন হবে। কিন্তু বহুবিবাহ সম্পর্কে কিছু বলার পূর্বে সেই উদ্দেশ্য বর্ণনা করে দেওয়া আবশ্যক যা ইসলামী শরীয়তে নিকাহ প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, অন্যান্য উদ্দেশ্য ছাড়া এই উদ্দেশ্যর ব্যাপকতার উপরই বহুবিবাহের যৌক্তিকতা অনেকাংশে নির্ভর করছে। অতএব জ্ঞাতব্য বিষয় হল, কুরআন করীম থেকে নিকাহর চারটি উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। প্রথমত, মানুষ এর মাধ্যমে অনেক দৈহিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাধি এবং এর কুপ্রভাব থেকে নিরাপদ থাকে। আরবী ভাষায় এই অবস্থাকে 'এহসান' বলা হয়, যার আভিধানিক অর্থ হল দূর্গের মধ্যে সুরক্ষিত থাকা। দ্বিতীয়ত উদ্দেশ্য হল বংশ বিস্তার, তৃতীয় উদ্দেশ্য হল জীবনসঙ্গী এবং আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করা। চতুর্থ উদ্দেশ্য হল ভালবাসা ও রহমতের সম্পর্কের প্রসার। কুরআন করীমে বলা হয়েছে-

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ (سورة نساء:25)

এবং উহারা ব্যতিরেকে বাকী সকলকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে, এইভাবে যে তোমরা আপন অর্থ দ্বারা পবিত্রতা রক্ষার্থে বিবাহ করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ কর, অবৈধ কাম চরিতার্থে নহে।(সূরা নিসা: ২৫)

এই আয়াতে 'এহসান'-এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ (ক) নিকাহর মাধ্যমে মানুষ কতিপয় বিশেষ ধরণের শারিরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা পায়, যেগুলি কৌমার্যের পরিণামে সৃষ্টি হয়। (খ) মানুষ কতিপয় আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকে এবং অপবিত্র চিন্তাধারা এবং অবৈধ সম্পর্কে যেন লিপ্ত না হয়। এই উদ্দেশ্যটিকেই অন্য একটি আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে-

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

তাহারা তোমাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক, এবং তোমরা তাহাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক। (আল বাকারা: ১৮৮)

অর্থাৎ তোমরা পরস্পরকে দোষত্রুটি ও রোগব্যাধি থেকে মুক্ত রাখার মাধ্যম। যেভাবে বস্ত্র মানুষের জন্য শীত-গ্রীষ্মের কষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যম হয়ে থাকে। এই আয়াতে যেহেতু মহিলাদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করতে হত, সেই কারণে ভাষার প্রয়োগকে পরিমার্জিত করা হয়েছে। এছাড়াও এই আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মহিলা ও পুরুষ উভয়ে পরস্পরের দোষত্রুটি আড়াল করার মাধ্যম, যেভাবে বস্ত্র মানুষের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখে। অতঃপর বলা হয়েছে-

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ, সুতরাং তোমরা যখন যেভাবে চাহ তোমাদের ক্ষেত্রে গমন কর, এবং তোমরা নিজেদের জন্য (উত্তম কিছু) অগ্রে প্রেরণ কর।

(আল বাকারা: ২২৪)

এই আয়াতে বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মানব প্রজন্মের ধারা যেন অব্যাহত থাকে। এরই সাথে খোদা তা'লা অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ইঙ্গিতও করেছেন যে, স্ত্রীদের মাধ্যমে যেহেতু ভবিষ্যত প্রজন্ম টিকে থাকবে, তাই পুরুষ নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সময় যেন এমন পদ্ধতি অবলম্বন করে যার ফলে ভবিষ্যত প্রজন্ম নষ্ট না হয়, বরং উন্নত থেকে উন্নততর বংশ সৃষ্টি হয়। অতঃপর বলেন-

خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً (سورة روم:22)

তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হইতে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা তাহাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করিতে পার, এবং তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম–প্রীতি ও দয়া-মায়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই আয়াতে নিকাহর তৃতীয় ও চতুর্থ উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ স্বামী তার স্ত্রীর মধ্যে এবং স্ত্রীর স্বামীর মধ্যে নিজের জীবনসঙ্গীকে খুঁজে পায় আর তারা পরস্পরের সাহচর্যে আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ নিকাহর মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রীর আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে সম্পর্ক বন্ধন সুদৃঢ় হয় আর পারিবারিক আত্মীয়তা ছাড়াও নাড়ির সম্পর্ক তৈরীর মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবার এবং গোত্রের মধ্যে ভালবাসা ও রহমতের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ তৈরী হয়।

মোটকথা ইসলামী শরিয়তে নিকাহর চারটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম উদ্দেশ্য হল, 'এহসান' অর্থাৎ একাধিক শারিরিক ব্যাধি এবং আধ্যাত্মিক ব্যাধি ও সেগুলির কুপ্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকা। দ্বিতীয়, বংশ বিস্তার, তৃতীয় জীবনসঙ্গী ও আন্তরিক প্রশান্তি এবং চতুর্থ বিভিন্ন পরিবার বা গোত্র পারস্পরিক ভালবাসা ও রহমতের বন্ধনের মাধ্যমে পরস্পর মিলিত হওয়া। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এই সমস্ত উদ্দেশ্যাবলী কেবল বৈধই নয়, বরং অত্যন্ত পবিত্র এবং মানব প্রকৃতি এবং মানবজাতির চাহিদাবলীর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এর মাধ্যমে স্বামী -স্ত্রীর সম্পর্ককে এক সুদৃঢ় ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এর সম্পর্কের মাধ্যমে সর্বোত্তম ফলাফল তৈরী করার উপায় বের করা হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যাবলীর তুলনায় যে উদ্দেশ্যকে কুরআন করীম সুনির্দিষ্টভাবে অবৈধ আখ্যায়িত করেছে এবং মুসলমানদেরকে বিরত রেখেছে সেটি হল উত্তেজনা ও এবং কামলোলুপ দৃষ্টি।

এখন আমি সেই উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করব যা বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়ার সময় ইসলাম দৃষ্টিপটে রেখেছে। তাই ইসলামী শরীয়ত অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, এই উদ্দেশ্য দুটি শ্রেণীর। প্রথমতঃ সেই সাধারণ উদ্দেশ্য যা নিকাহর ক্ষেত্রে দৃষ্টিপটে রাখা হয়েছে এবং উপরে যা বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় হল সেই বিশেষ উদ্দেশ্য যা বহুবিবাহের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখে। প্রথমে বর্ণিত উদ্দেশ্যটিকে বহুবিবাহের ক্ষেত্রে এই কারণে বজায় রাখা হয়েছে যে, অনেক সময় একটি স্ত্রী দ্বারা নিকাহর উদ্দেশ্য পূর্ণ রূপে অর্জিত হয় না আর এই কারণেই এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যেমন- নিকাহর উদ্দেশ্য হল 'এহসান' বা রক্ষা করা। অর্থাৎ এর মাধ্যমে মানুষ যেন কতিপয় রোগ-ব্যাধি এবং পাপাচার থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, একজন মহিলা যে কিনা মাসিক, গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, শিশুকে স্তনপান এবং বিভিন্ন ধরণের রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির কারণে ব্যাতিব্যস্ত থাকে, তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে মানুষ নিজের তাকওয়া ও পবিত্রতা বজায় রাখতে পারে না। আর সে যদি অসাধ্য চেষ্টা সাধনের দ্বারা নিজেকে বাহ্যিক অপকর্ম থেকে রক্ষা করলেও অপবিত্র চিন্তাধারা তার মন ও মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে। কিম্বা এইভাবে দমে থাকার ফলে তার কোন শারিরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে, পুনর্বিবাহই এমন ব্যক্তির সঠিক চিকিৎসা। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে নিকাহ করতে তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তার এমন অবস্থা তাকে দ্বিতীয় নিকাহ করতে উৎসাহিত করবে। অনুরূপভাবে নিকাহর অপর একটি উদ্দেশ্য হল বংশ রক্ষা করা। কিন্তু যদি কারো স্ত্রীর কোন সন্তান না থাকে বা পুত্র সন্তান না থাকে, তবে এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দ্বিতীয় নিকাহ্‌র তার জন্য বৈধতা পায়। অনুরূপভাবে নিকাহর অপর উদ্দেশ্য হল জীবনসঙ্গী এবং আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করা, কিন্তু কারো স্ত্রী যদি চির ব্যাধিগ্রস্ত হয়, এমনকি সে শয্যাশায়ী ও উন্মাদ হয়ে যায় তবে সেই পরিস্থিতিতে এমন ব্যক্তির জীবনসঙ্গীর চাহিদা ও আন্তরিক প্রশান্তি পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রয়োজন হবে। অনুরূপভাবে নিকাহ্‌র আরেকটি উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন পরিবারের পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং প্রেম ও সম্প্রীতির সুযোগ তৈরী করা। কিন্তু এমন হতে পারে যে, এক ব্যক্তি প্রথমে এমন এক পরিবারে বিবাহ করেছে যেখানে তার জন্য এই ভালবাসার সম্পর্ক তৈরী হওয়া

আবশ্যক ছিল, কিন্তু হয়তো এরপর তার জন্য এর থেকেও বেশি জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ আসবে যেখানে এই সম্পর্ক তৈরী হওয়া পারিবারিক বা জাতিগত বা রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিষয়ের অধীনে অত্যন্ত জরুরী এবং পছন্দীয় হয়, তেমন পরিস্থিতিতে তার জন্য একের অধিক বিবাহ করা আবশ্যক হবে। মোটকথা ইসলাম নিকাহ্‌র যে উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করেছে, সেটিই বিশেষ পরিস্থিতিতে একাধিক বিবাহের ভিত রচনা করে। উপরোক্ত পরিস্থিতিগুলি উদাহরণ স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, অন্যথায় আরও কিছু পরিস্থিতির উদ্ভবও হতে পারে যেখানে একজন স্ত্রীর দ্বারা নিকাহ্‌র উদ্দেশ্য উত্তমরূপে পূর্ণ হয় না এবং স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রয়োজন এসে পড়ে। কিন্তু এই সকল উদ্দেশ্যাবলী ছাড়াও ইসলাম একের অধিক বিবাহের আরও কিছু কারণ বর্ণনা করেছে। এর তিনটি কারণ রয়েছে। ১) অনাথদের নিরাপত্তা, ২) বিধবাদের নিরাপত্তা এবং ৩) বংশবৃদ্ধি। আল্লাহ্ তা'লা কুরান মজীদে বলেন-

وَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تُقۡسِطُوۡا فِی الۡیَتٰمٰی فَانۡکِحُوۡا مَا طَابَ لَکُمۡ مِّنَ النِّسَآءِ مَثۡنٰی وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تَعۡدِلُوۡا فَوَاحِدَۃً

যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, তোমরা এতীমদের ব্যাপারে ন্যায়-বিচার করিতে পারিবে না, তাহা হইলে তোমরা (অন্য) নারীদের মধ্য হইতে (যাহারা এতীম নহে) তোমাদের পসন্দমত দুইজন অথবা তিনজন অথবা চারজনকে বিবাহ কর, তবে তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তোমরা ন্যায় বিচার করিতে পারিবে না, তাহা হইলে একজনকে।

(সূরা নিসা: ৪)

এই আয়াতে একাধিক বিবাহের আদেশের সঙ্গে এতিম বা অনাথদের উল্লেখ করে এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বস্তুতঃ এতিমদের আধিক্যও বহুবিবাহের একটি অন্যতম কারণ এবং এতিমদের সংখ্যাধিক্য মানে পক্ষান্তরে বিধবাদের সংখ্যাধিক্যই বটে। দ্বিতীয়ত ভবিষ্যতের বংশধারার গতিকে হ্রাস করতে পারে তারা এমন আশঙ্কা তৈরী করে। আর এমনিতেও একত্রে এই তিনটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয় একমাত্র যুদ্ধের কারণেই। এই কারণে এই আয়াতে খোদা তা'লা অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গিতে একাধিক বিবাহের সমস্ত অতিরিক্ত উদ্দেশ্যাবলীকে একত্রিত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এতীমদের নিরাপত্তা, বিধবাদের ব্যবস্থা এবং বংশবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ার প্রতিকার। আরও বিস্তারিত ব্যাখা ও বিবরণের জন্য এদের বিষয়ে পৃথক পৃথক উল্লেখও করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

وَاَنۡکِحُوا الۡاَیَامٰی مِنۡکُمۡ

(সূরা নূর: ২৩)

অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! (এখন আমরা তোমাদের জন্য একাধিক বিবাহের ব্যতিক্রমী চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি) এখন তোমাদেরকে যথাসাধ্য এমন ব্যবস্থা করা উচিত যে, যুবতী হোক বা বিধবা, কোন মহিলাই যেন অবিবাহিত না থাকে।

এই আয়াতে অবিবাহিত মহিলাদের বিবাহের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে, বিশেষ করে বিধবাদের।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنۡ مَعۡقِلِ بۡنِ یَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوۡلُ اللّٰہِ صلی اللہ علیہ وسلم تَزَوَّجُوا الۡوَدُوۡدَ الۡوَلُوۡدَ فَاِنِّیۡ مُکَاثِرٌ بِکُمُ الۡاُمَمَ۔

মোয়াকেল বিন ইয়সার থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ-হযরত (সা.) তাঁর সাহাবাদেরকে বলতেন, তোমাদের উচিত সেই মেয়ের সঙ্গে বিবাহ করা যে অনেক ভালবাসে এবং বেশি সন্তান জন্ম দেয়, যাতে তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং কিয়ামতের দিন আমি নিজের জাতির সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করতে পারি।

এই হাদীসে বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এইভাবে ইসলাম একাধিক বিবাহের মোট সাতটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে। যেগুলি হল- শারিরিক ও আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি, বংশরক্ষা, জীবনসঙ্গী এবং অন্তরের প্রশান্তি, ভালবাসা ও রহমতের সম্পর্কের বিস্তার, এতীমদের ব্যবস্থা, বিধবাদের ব্যবস্থা এবং বংশবৃদ্ধি। কিন্তু এখন প্রশ্ন ওঠে যে, এই উদ্দেশ্যাবলী কিভাবে অর্জিত হবে। অর্থাৎ কোন মাপকাঠির ভিত্তিতে স্ত্রী নির্বাচন করা যায় যাতে এই উদ্দেশ্যাবলী সুষ্ঠভাবে পূর্ণ হতে পারে? এই সম্পর্কে আঁ-হযরত (সা.) বলেন-

تُنۡکَحُ الۡمَرۡاَۃُ لِاَرۡبَعٍ لِمَالِہَا وَلِحَسَبِہَا وَجَمَالِہَا وَلِدِیۡنِہَا فَاظۡفَرۡ بِذَاتِ الدِّیۡنِ تَرِبَتۡ یَدَاکَ۔

(বুখারী, কিতাবুন নিকাহ্)

অর্থাৎ নিকাহর জন্য পাত্রী নির্বাচনের জন্য চারটি বিষয়কে মাথায় রাখা হয়। কিছু মানুষ পাত্রীর আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে পাত্রী নির্বাচন করে। কেউ বা বংশের গৌরবকে দৃষ্টিতে রাখে, কেউ সৌন্দর্যের দিকটি লক্ষ্য রাখে আবার কেউ পাত্রীর চারিত্রিক সৌন্দর্য্য ও ধর্মপরায়ণতাকে দৃষ্টিপটে রাখে। কিন্তু হে মুসলমানেরা! তোমাদের উচিত সব সময় ধর্মের দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া। এটিই তোমাদের সফলতার পথ এবং জগতের মন্দ দিক থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়।

এই হাদীসে নিকাহর উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য পাত্রী নির্বাচনের নীতি বর্ণনা করা হয়েছে আর সেটি হল এই যে, ধর্মের বিষয়টিকে প্রধান্য দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আর 'দ্বীন' বা ধর্ম বলতে কেবল মহিলার নিজের ধর্মীয় বা চারিত্রিক অবস্থার কথা বোঝানো হয় নি বা 'দ্বীন' শব্দটি আরবি ভাষায় কেবল ধর্ম বা মতবাদ বোঝাতেই ব্যবহৃত হয় না। বরং আরবী প্রসিদ্ধ অভিধান 'আকরাবুল মোয়ারেদ'-এ এর অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'দ্বীন' শব্দটি আরবী ভাষায় নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত স্বভাব ও চরিত্র, দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক পবিত্রতা, তৃতীয় ধর্ম, চতুর্থ জাতি ও সম্প্রদায় এবং পঞ্চম রাজনীতি ও প্রশাসন। অতএব মহানবী (সা.) এই যে বলেছেন পাত্রী নির্বাচনে ধর্মীয় দিকটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, এই নির্দেশ দ্বারা একদিকে যেমন বোঝানো হয়েছে যে, স্ত্রী এমন হওয়া উচিত যে ব্যক্তিগতভাবে স্বভাব-চরিত্র, তাকওয়া ও পবিত্রতা এবং ধর্ম ও মতবিশ্বাসের ক্ষেত্রে যেন ভাল হয়, যাতে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কও ভাল থাকে আর ভবিষ্যত প্রজন্মের উপরও তার প্রভাব পড়ে। অপরদিকের এও বোঝানো হয়েছে যে, স্ত্রী নির্বাচনে সে সাধারণ ধর্মীয় দিকটিও যা ধর্মীয়, জাতিগত ও রাজনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, সেদিকেও দৃষ্টিতে রাখা উচিত। আর যদি এই স্থানে কারো মনে কোন সংশয় দেখা দেয় যে, আভিধানিক দিক থেকে এই অর্থগুলি হয়তো সঠিক, কিন্তু এটি কিভাবে স্বীকার করা যেতে পারে যে, একটি শব্দের একই সময়ে এতগুলি অর্থ হবে। এর উত্তর হল, আঁ-হযরত (সা.) ছিলেন একজন আইন প্রণেতা নবী। তাঁর বাণী আইনের মর্যাদা রাখত যা সব সময় সম্পূর্ণ ব্যাপক ও গভীর অর্থবহ ছিল। তাঁর বাণীর প্রত্যেকটি শব্দ একাধিক আঙ্গিককে দৃষ্টিপটে রাখা হত এবং এরই আলোকে তাঁর বাণীর অর্থ করা উচিত। যাইহোক আভিধানিক দিক থেকে এই অর্থগুলি যখন সঠিক, তখন কারো আপত্তি করার অধিকার নেই।

সারসংক্ষেপ হল, ইসলাম নিকাহর চারটি ও একাধিক বিবাহের সাতটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে। এই উদ্দেশ্যগুলি যথাযথভাবে অর্জন করতে হলে স্ত্রী নির্বাচন সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছে যে, এক্ষেত্রে পাত্রীর ব্যক্তিগত গুণাগুণ ছাড়াও ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা, জাতি ও সমাজের কল্যাণ এবং দেশের স্বার্থকেও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এর এ অর্থ নয় যে, নিকাহর বিষয়ে অন্যান্য গুণাবলীর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে না, কেননা আঁ-হযরত (সা.)-এর অপর এক হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, তিনি (সা.) মুসলমানদেরকে পাত্রীর আরও অন্যান্য গুণাবলীকেও দৃষ্টিপটে রাখার অনুমতি প্রদান করেছেন, এমনকি তিনি (সা.) নিজে অনেক সময় অন্যান্য বিষয়াদির প্রতিও দৃষ্টি দিতে উৎসাহ দান করেছেন। সুতরাং পর্দার আদেশ থাকা সত্ত্বেও তিনি (সা.) বলতেন পুরুষের উচিত নিকাহর পূর্বে পাত্রীকে নিজে একবার দেখা। (তিরমিযি, আবওয়াবুন নিকাহ্) যাতে পরবর্তীতে চেহারা অপছন্দের কারণে তার প্রতি বিতৃষ্ণা না জন্মে। অনুরূপভাবে আর্থিক সামঞ্জস্যের দিকটিকেও এক সীমা পর্যন্ত দৃষ্টিতে রাখার কথা বলা হয়েছে।

(মুসলিম, কিতাবুর রিযা)

অনুরূপভাবে একটি সীমা পর্যন্ত বয়স এবং প্রকৃতির সামঞ্জস্যের দিকটিকেও দৃষ্টিপটে রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।

(মুসলিম, কিতাবুর রিযা)

আর এই নীতিই অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু ইসলাম যে নির্দেশ দেয় তা হল, এই বিষয়গুলিকে ধর্মীয় দিকটির তুলনায় প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয়। কেননা, যদি ধর্মীয় দিকের সৌন্দর্য না থাকে তবে এই গুণগুলি প্রকৃত ও চিরস্থায়ী সুখ ও আনন্দের ভিত্তি হতে পারে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে।

এখন একদিকে বহুবিবাহের উদ্দেশ্যাবলী এবং অপরদিকে পাত্রী নির্বাচনে ইসলাম নির্দেশিত পথ দৃষ্টিপটে রাখলে প্রত্যেক বিবেকবান মানুষ বুঝতে পারবে যে, এটি এক অত্যন্ত আশিসময় ব্যবস্থাপনা যা আঁ-হযরত (সা.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শুধু তাই নয়, এর অভিপ্রায় হল মানবজাতির এক বিরাট অংশের

অসাধারণ কল্যাণ সাধন। বস্তুতঃ যারা বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে , এর পেছনে কাজ করেছে তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টি, আর স্বামী-স্ত্রীর আবেগপ্রবণ সম্পর্কটির উর্দ্ধে কোন বিষয়ের দিকেই তাদের দৃষ্টি যায় নি। আর এরা কখনো ধীর মস্তিষ্কে নিকাহর উদ্দেশ্যাবলী এবং মানবজাতির চাহিদাবলীর বিষয়ে চিন্তাভাবনাও করে নি। অন্যথায়, কোন বিবেকবান ব্যক্তির জন্য এর গুণাবলীকে অস্বীকার করার কোন উপায় ছিল না। আর একথাও ভেবে দেখা হয় নি যে, ইসলামে বহুবিবাহের ব্যবস্থা কোন নিয়ম হিসেবে রাখা হয় নি, বরং নিকাহর বৈধ উদ্দেশ্যাবলী অর্জন এবং বংশধারাকে সচল রাখার বৈধ চাহিদা পুরণের জন্য বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি দৃষ্টিপটে রেখে এটি একটি বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। অতএব এর বিরোধীতা করার পূর্বে এবিষয়টি ভেবে দেখা দরকার যে, মানুষ কি পৃথিবীতে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে না যখন বহুবিবাহ তার জন্য এক জরুরী প্রতিকার হিসেবে দেখা দেয় এবং দ্বিতীয় বিবাহ করা তার পরিবার, জাতি বা দেশের স্বার্থ ও কল্যাণের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে? সম্রাট নেপোলিয়ানের জীবনের একটি ঘটনা আমি কখনো ভুলি না। তিনি নিজের দেশের স্বার্থে সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিবাহের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই চাহিদা পুরণ হল কিভাবে? সে কথা কল্পনা করলেও আমার শরীর কেঁপে ওঠে। সম্রাটের সাম্রাজ্ঞী যোসেফাইনের তালাকের ঘটনা ইতিহাসের সব থেকে কালো অধ্যায়গুলির মধ্যে অন্যতম। অন্যদিকে এর গভীরে এই মিথ্যা আবেগপূর্ণ চিন্তাধারা রয়েছে যে,কোন পরিস্থিতিতেই মানুষের দ্বিতীয় বিবাহ করা উচিত নয়। পরিতাপের বিষয় হল, মিথ্যা আবেগপূর্ণ চিন্তাধারা অনেক দুর্বল মানুষের তাকওয়া হরণ করেছে। অনেক পরিবারকে নির্বংশ করে ধ্বংস করে দিয়েছে। অনেক পরিবারের সুখ-শান্তি বিনষ্ট করেছে। অনেক বংশ, জাতি ও দেশের ঐক্যের আশায় জল ঢেলে দিয়েছে। অনেক অনাথদেরকে ভবঘুরে বানিয়ে দিয়েছে এবং অনেক বিধবাদেরকে অসহায় ও সম্বলহীন করে রেখেছে। অনেক জাতির বংশধারাকে অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিয়ে তাদের ধ্বংসের বীজ বপন করেছে। আর এই সব কিছু হয়েছে এই কারণে যে, স্ত্রীরা যেন সকল পরিস্থিতিতে নিজেদের স্বামীর মনোযোগের একমাত্র বিন্দু হয়ে থাকে! কিন্তু এটি একটি অদ্ভুত ত্যাগস্বীকার, যেখানে মহৎ বস্তুকে তুচ্ছ বস্তুর জন্য বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে। অথচ নৈতিক উপকারিতার কারণে পার্থিব উপকারিতাকে ত্যাগ করাই বিধেয় ছিল। উচিত ছিল ধর্মীয় উপকারিতার কারণে পার্থিব লাভ বিসর্জন দেওয়া, পারিবারিক স্বার্থের কারণে ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া, জাতিগত স্বার্থের কারণে ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া। বস্তুতঃ বহুবিবাহের ব্যবস্থাই একটি ত্যাগস্বীকারের এক প্রতিমূর্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের ব্যক্তিগত এবং বাহ্যিক ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে নৈতিক, ধর্মীয়, পারিবারিক এবং জাতিগত এবং দেশের কল্যাণের স্বার্থের জন্য পথ খোলা হয়েছে। সারসংক্ষেপ হল এই যে, ইসলামে বহুবিবাহের ব্যবস্থাটি একটি বৈকল্পিক ব্যবস্থা যা মানুষের বিশেষ প্রয়োজনকে দৃষ্টিপটে রেখে সূচিত হয়েছে। আর এটি একটি ত্যাগস্বীকার যা নারী ও পুরুষ উভয়ে নিজের নৈতিক, ধর্মীয়, পারিবারিক, জাতিগত এবং দেশের জন্য বিশেষ পরিস্থিতিতে করতে হয় আর ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে আশা রাখে যে, বহুবিবাহের জন্য আবশ্যক উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সে নিজের কামনা-বাসনা ও দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ মহৎতর স্বার্থের উদ্দেশ্যে বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ করবে না এবং সুযোগ এলেই প্রমাণ করে দিবে যে, তার জীবন কেবল নিজের সত্তা বা পরিবার পর্যন্তই সীমিত নয়, বরং পৃথিবীর বৃহত্তর মানবতার এক সদস্য মাত্র, যে মানবতার নিমিত্তে তার নিজের ব্যক্তিসত্তা ও স্বার্থকে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়।

অতঃপর একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, বহুবিবাহের বৈধ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেও ইসলাম বহুবিবাহকে আবশ্যক হিসেবে গণ্য করে নি, বরং যেরূপ উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, এর সঙ্গে শর্ত রয়েছে যে, মানুষ যদি ন্যায় করতে সক্ষম হয় কেবল তখনই বহুবিবাহের উপর আমল করা উচিত, অন্যথায় কেবল একটি স্ত্রী নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আর এখানে ন্যায় বিচার বলতে স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় বিচারকে বোঝানো হয় নি, বরং তাদের যাবতীয় প্রকারের অধিকার প্রদানকে বোঝানো হয়েছে যা একাধিক স্ত্রীর পরিস্থিতিতে পুরুষের জন্য আবশ্যক হয়ে পড়ে। অতএব একের অধিক বিবাহের জন্য দুটি শর্ত রয়েছে। এক, সেই সব বৈধ উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে কোন একটি প্রয়োজন অনুভূত হওয়া যা এর জন্য ইসলাম নির্দিষ্ট করেছে। দুই, ন্যায়পরায়ণ থাকতে পারা। এই দুটি শর্ত পূর্ণ হওয়া ছাড়াও বহুবিবাহ অনুশীলনকারী ব্যক্তিকে নিজের সময়, মনোযোগ, সম্পদ, বাহ্যিক আচার-আচরণ-মোটকথা আন্তরিক ভালবাসা ছাড়া, যার উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ থাকে না, অন্য যাবতীয় বিষয়ে স্ত্রীদের সঙ্গে নিরপেক্ষ ও সাম্যের আচরণ করতে হবে। (মিশকাত, কিতাবুল কসম)। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখে যাবে যে, স্বামী নিজেই নিষেধাজ্ঞা হিসেবে একটি মহান ত্যাগস্বীকারে বাধ্য থাকে। বিশেষ করে এমন পরিস্থিতিতে যখন কিনা সে নিজের স্ত্রীদের মধ্যে কারো ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও পরিস্থিতিতে পার্থক্যের কারণে কারো প্রতি কম বা বেশি ভালবাসা হতে পারে, কিন্তু তাসত্ত্বেও সে নিরুপায় থাকে, সে সমস্ত জিনিসকে দাঁড়িপাল্লায় মেপে স্ত্রীদের মধ্যে সমবন্টন করতে বাধ্য থাকে। এই ত্যাগস্বীকার কেবল স্বামীর জন্য হয় না, বরং তার স্ত্রীরাও সমান অংশীদার হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, বহু বিবাহের বিষয়ে ইসলামে কেবল বিলাসিতা চিন্তাধারাকেই প্রতিহত করে নি, বরং এর জন্য ব্যবহারিক এই শর্তও রাখা হয়েছে যেন কোন ব্যক্তি যে এই শর্তাবলী মান্য করে ভোগ-বিলাসিতার মধ্যেই না পড়তে পারে।

এস্থানে একথা উল্লেখ করাও আবশ্যক যে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবজাতি এবং পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যেও বহুবিবাহের ক্ষেত্রে কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী একাধিক স্ত্রী রাখতে পারত। কিন্তু ইসলাম ছাড়া দ্বিতীয় শর্ত চাপানো ছাড়াও স্ত্রীর সংখ্যাও সীমিত রেখেছে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, যে সমস্ত মুসলমানরা চারের অধিক বিবাহ করেছিল তাদেরকে চারটি স্ত্রীর ছাড়া অতিরিক্তদেরকে তালাক দেওয়ার আদেশ দেওয়া হত। যেমন, গীলান বিন সালমা সাকফীর দশজন স্ত্রী ছিল, যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে ছয়জনকে আদেশ জারি করে তালাক দেওয়ানো হয়।

(তিরমিযি, আবওয়াবুন নিকাহ)

আঁ-হযরত (সা.)-এর একাধিক বিবাহতে কোন্ উদ্দেশ্য দৃষ্টিপটে ছিল এখন তা তুলে ধরব, কেননা আমার মূল বিষয়বস্তু এটিই। অতএব জ্ঞাতব্য বিষয় হল, আঁ-হযরত (সা.)-এর বিবাহের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যাবলী সেগুলিই ছিল যা ইসলাম সাধারণত বহুবিবাহের কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছে এবং যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে বিশেষ করে তাঁর দৃষ্টিপটে ছিল বংশরক্ষা, ভালবাসা ও রহমতের সম্পর্কের বিস্তার এবং অনাথ ও বিধবাদের ব্যবস্থা করা । ভালবাসা ও রহমতের সম্পর্কের বিস্তারের জন্য আঁ-হযরত (সা.)-এর দৃষ্টিতে এমন মহিলারা ছিলেন যারা ধর্মীয় , জাতি ও গোষ্ঠীগত এবং রাজনীতিক ও প্রশাসানিক প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি উপযুক্ত ছিলেন। যাইহোক সাধারণ পরিস্থিতি ছাড়া বিশেষ পরিস্থিতিতে আঁ-হযরত (সা.) -এর একাধিক বিবাহের কিছু বিশেষ কারণও ছিল। এই উদ্দেশ্য দুটি ছিল। এক, তাঁর নিজের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অজ্ঞতাপূর্ণ প্রথা ও ভ্রান্তবিশ্বাসের বাস্তবিক অবসান ঘটানো। দ্বিতীয়, কিছু যোগ্য মহিলাদেরকে তাঁর নিজের প্রশিক্ষণের অধীনে রেখে তাদের মাধ্যমে মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ইসলামের শরীয়তের সেই অংশটিকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করা এবং মুসলমান মহিলাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেন-

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا (سورة احزاب:38)

(সূরা আহযাব: আয়াত-৩৮)

এই আয়াতে প্রথম উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্য হল, আঁ-হযরত (সা.)-এর ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে সেই সমস্ত অজ্ঞতাপূর্ণ প্রথা ও অন্ধবিশ্বাসকে সমূলে উৎপাটন করা যা আরবদের স্বভাব-প্রকৃতিতে এমনভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল যে, সেগুলি সম্পূর্ণভাবে উৎপাটিত হওয়া সম্ভব ছিল না, যদি না তিনি স্বয়ং এক ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন। পৌষ্যপুত্রগ্রহণ করা আরবে বহুল প্রচলিত একটি প্রথা ছিল আর এই বিষয়ে ঐশী আদেশ নাযেল হওয়ার পূর্বে মহানবী (সা.) নিজের মুক্তি দেওয়া ক্রীতদাস যায়েদ বিন হারসাকে পৌষ্যপুত্র রেখেছিলেন। সুতরাং যখন এই ঐশী আদেশ নাযেল হল যে, কেউ

কাউকে কেবল পৌষপুত্র রাখলেই সে তার পুত্র হয়ে যায় না এবং যায়েদ বিন হারসা নিজের স্ত্রী জয়নব বিনতে জাহাশকে তালাক দিল, তখন আঁ-হযরত (সা.) ঐশী নির্দেশের অধীনে জয়নবের সঙ্গে স্বয়ং বিবাহ করেন আর এইভাবে সেই অজ্ঞতাপূর্ণ প্রথাটিকে চিরতরের জন্য নির্মূল করেন যা তাঁর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন ছাড়া সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হওয়া অসম্ভব ছিল। এছাড়াও তিনি জয়নাবের সঙ্গে বিবাহ করে এবিষয়েরও ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত রেখেছেন যে, কোন তালাক-প্রাপ্ত মহিলাকে বিবাহ করার মধ্যে দোষের কিছু নেই।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ○ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদিগকে বল, " যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও উহার শোভা-সৌন্দর্য কামনা কর, তাহা হইলে আইস, আমি তোমাদিগকে সুখ-সম্ভোগের সামগ্রী দিব। এবং তোমাদিগকে অতি সুন্দরভাবে বিদায় করিব। কিন্তু যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রসুল এবং পারলৌকিক গৃহ কামনা কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য হইতে সৎকর্মশীলগণের জন্য মহান পুরস্কার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

(সূরা আহযাব, আয়াত: ২৯-৩০)

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ (سورة احزاب:33)

হে নবীর পত্নীগণ! তোমরা কোন সাধারণ নারীগণের মত নহ, যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করিয়া চল (সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৩)

وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ○ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ○

এবং নামায কায়েম করিও, যাকাত দিও এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিও। হে আহলে বয়াত (নবী-পরিবার) নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগ হইতে সর্বপ্রকার কলুষ দূরীভূত করিতে এবং তোমাদিগকে পূর্ণরূপে পবিত্র করিতে চাহেন।

এবং আল্লাহ্র আয়াতসমূহ ও হিকম হইতে যাহা কিছু তোমাদের গৃহসমূহে আবৃতি করা হয় উহা তোমরা স্মরণ রাখিও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সকল বিষয়ে অবহিত।

(সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৪,৩৫)

এই আয়াতে আঁ হযরত (সা.)-এর বহুবিবাহের বিশেষ উদ্দেশ্যের মধ্যে দ্বিতীয় এবং মূল উদ্দেশ্যের বিষয়ে বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে উপযুক্ত মহিলাদেরকে স্ত্রী হিসেবে রেখে তাদেরকে মুসলমান মহিলাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা। এটিই সেই সবিশেষ উদ্দেশ্য যার অধীনে তাঁর একাধিক বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, এটি এমন এক উদ্দেশ্য যা তাঁর সত্তার সঙ্গে বিশিষ্ট ছিল। এই কারণেই সাধারণ মুসলমানদের জন্য একাধিক বিবাহের বিষয়ে যে সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করা হয়েছে তিনি (সা.) তার উর্দ্ধে ছিলেন। তিনি যেহেতু একজন বিধান আনয়নকারী নবী ছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমে পৃথিবীতে এক নতুন বিধান বা শরিয়ত আইন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত রচিত হওয়া নির্ধারিত ছিল, তাই কেবল তাঁর মাধ্যমে নতুন শরিয়ত বিধানে প্রচার ও প্রসার হওয়াই যথেষ্ট ছিল না, বরং স্বয়ং তাঁর নিজের তত্ত্বাবধানে এই নতুন বিধানকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলবৎ করানোও আবশ্যক ছিল যা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই কাজ অত্যন্ত দুরূহ এবং স্পর্শকাতর ছিল। যদিও পুরুষদের ক্ষেত্রেও তাঁর পথ বিপদসংকুল ছিল, কিন্তু মহিলাদের বিষয়ে তাঁর পক্ষে এই কাজটি অত্যন্ত কঠিন ছিল, কেননা, সাধারণত বাড়ির মধ্যে থাকায় এবং সাংসারিক কাজের ব্যস্ততার কারণে মহিলাদের কাছে তাঁর সহচার্য থেকে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার বেশি সুযোগ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ মহিলাদের প্রকৃতিগত লজ্জাশীলতার কারণে সেই সমস্ত বিশেষ বিষয়ে স্বাধীনভাবে জিজ্ঞাসা করতে পারত না যা মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। এর পাশপাশি তুলনামূলকভাবে মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার অভাব আর তারা অজ্ঞতাপূর্ণ রীতি-রেওয়াজ কঠোরভাবে মেনে চলার প্রবণতা বেশি থাকে, যার কারণে তারা নিজেদের প্রচলিত ব্যবস্থায় কোন প্রকার পরিবর্তন আনতে সহজে প্রস্তুত হত না। এমতাবস্থায় মহিলাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া আবশ্যক ছিল আর আঁ-হযরত (সা.) এর জন্য এর সর্বোত্তম পন্থা ছিল উপযুক্ত মহিলাদের বিবাহ করে নিজের প্রশিক্ষণের অধীনে তাদের এই কাজের যোগ্য করে তোলা এবং তাঁদের মাধ্যমে মুসলমান মহিলাদের শিক্ষা দান করা। সুতরাং এই প্রস্তাব উপযোগী প্রমাণিত হয় আর মুসলমান মহিলারা অত্যন্ত সুচারুরূপে এবং অল্প সময়ের মধ্যে নিজেদের জীবনকে নতুন শরীয়ত বিধানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিল। এমনকি পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মধ্যে এই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না যে, যেখানে নারী জাতি এত কম সময়ের মধ্যে এমন পরিপূর্ণতার সাথে এক সম্পূর্ণ নতুন বিধান ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে।

আঁ-হযরত (সা.)-এর বিবাহসমূহ প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে হয় নি, বরং ধর্মীয় উদ্দেশ্যের অধীনে হয়েছিল-এর একটি জলজ্যান্ত প্রমাণ হল এই যে, তিনি কিছু এমন মহিলাদেরকেও বিবাহ করেছিলেন যারা বয়সের সেই পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যেখানে তারা সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম ছিল না। যেমন হযরত উম্মে সালমা (রা.), যাঁর সঙ্গে আঁ-হযরত (সা.) ৪র্থ হিজরী সনে বিবাহ করেছিলেন, বিবাহের সময় তাঁর বয়স সন্তান জন্ম দেওয়ার সীমা পেরিয়ে গিয়েছিল। এই কারণেই তিনি এই বিষয়ে ওজর আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু আঁ-হযরত (সা.)-এর উদ্দেশ্য যেহেতু ধর্মীয় ছিল এবং এই কাজের জন্য তিনি অত্যন্ত উপযুক্ত ছিলেন, এই কারণে তিনি (সা.) তাঁকে সম্মত করতে অনেক পীড়াপীড়ি করেন এবং তাঁর সঙ্গে বিবাহ করেন।

(নিসাঈ, উদ্ধৃতি যুরকানী, ২য় খণ্ড, উম্মে সালমা ও ইবনে সাদের জীবনী, ৮ম খণ্ড, উম্মে সালমার জীবনী)

মোটকথা যে উদ্দেশ্য আঁ-হযরত (সা.) একাধিক বিবাহ করেছিলেন সেগুলি অত্যন্ত পবিত্র এবং আশিসময়, এবং সেগুলির প্রায় সব ক্ষেত্রেই নবুয়তের দায়িত্বাবলী পালনের বিষয়টি অভিপ্রেত ছিল। আর এ বিষয়টি কেবল বিবাহের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং আঁ-হযরত (সা.)-এর জীবনী অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে, তিনি যা কিছু কাজ করতেন, বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে জাগতিক বা ধর্মীয় বলে প্রতীত হলেও, বস্তুতঃ সব ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নবুয়তের দায়িত্বাবলী পালনের বিষয়টিই প্রাধান্য পেত। আর তিনি (সা.) কখনও জাগতিকতার মোহে প্রলুব্ধ হন নি। নিম্নোক্ত হাদীসে তাঁর জীবনের এক অনবদ্য চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم نَامَ عَلٰى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدْ اَثَّرَ فِيْ جَسَدِهٖ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمَرْتَنَا اَنْ نَبْسُطَ لَكَ وَنَعْمَلَ فَقَالَ مَالِيْ وَلِلدُّنْيَا وَمَا اَنَا وَالدُّنْيَا اِلَّا كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا-

(মসনদ আহমদ ও তিরমিযি, উদ্ধৃতি মিশকাত, কিতাবুর রিকাক, পৃষ্ঠা: ৪৪২)

অর্থাৎ ইবনে মাসুদ বর্ণনা করেন যে, একবার আঁ-হযরত (সা.) একটি মোটা ও অমসৃণ মাদুরের উপর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তিনি ঘুম থেকে জাগার পর তাঁর শরীরে মাদুরের চিহ্ন এঁকে যায়। আমি তাঁর সমীপে নিবেদন করি, হে রসুলুল্লাহ্! আপনি চাইলে আপনার জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দের উপকরণ আমরা এনে হাজির করতে পারি। তিনি (সা.) বললেন, ইবনে মাসুদ! জাগতিক ভোগবিলাসের সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক? আমার এবং এই জগতের উপমা এক পথিকের ন্যায় যে পথ চলতে চলতে কোন বৃক্ষের ছায়াতলে ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করে এবং পুনরায় উঠে পথ চলতে আরম্ভ করে।

এই হাদীসের অর্থ এই নয় যে, জাগতিক কল্যাণরাজি থেকে উপকৃত হওয়া নিষিদ্ধ, কেননা, ইসলাম কোন বৈধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ লাভ করতে বাধা দেয় না, বরং স্বয়ং কুরআন করীমে এই দোয়া শেখানো হয়েছে যে,

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে ইহকালেও কল্যাণ এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর।

(আল-বাকারা: আয়াত-২০২)

অতএব উপরোক্ত হাদীসের অর্থ হল জাগতকি সুখ-স্বাচ্ছন্দ লাভ করাকে মানুষের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য মনে

করা উচিত নয়। এছাড়াও এই হাদীসে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আঁ হযরত (সা.)-এর ব্যক্তিগতভাবে জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দের প্রতি কখনো কোন আগ্রহ ছিল না। আর যতদূর জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দের সম্পর্ক, তাঁর জীবন একজন পথিকের থেকে কোন অংশে বেশি কিছু ছিল না।

বহুবিবাহ সম্পর্কে এই লেখায় একথার উল্লেখ করে দেওয়াও সমীচিন হবে যে, বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামই একমাত্র ধর্ম নয়, বরং পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মে বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেমন মূসার শরীয়তে এর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। (দ্বিতীয় অধ্যায়, আয়াত: ১৫) বানী ইসরাইলের অনেক নবী এর উপর অনুশীলন করেছেন। (যেমন হযরত ইব্রাহিম, হযরত ইয়াকুব, হযরত দাঊদ এবং হযরত সুলেমান (আ.) ও প্রমূখদের জীবনী দ্রষ্টব্য)

হিন্দুধর্মে বহুবিবাহের অনুমতি রয়েছে। (মনু, ৯/১২, ৯/১৪৯, ৯/১৮৩) এবং অনেক হিন্দু মহাপুরুষের একাধিক স্ত্রী ছিল। যেমন কৃষ্ণ একাধিক স্ত্রীর শিক্ষা অনুসরণ করতেন। (শ্রী কৃষ্ণ, প্রণেতা লালা লাজপত রাই, পৃষ্ঠা: ৯৭-৯৮) আর হিন্দু রাজা-মহারাজারা এখন একাধিক স্ত্রী রাখেন। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ নাসেরীরও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে কোন বর্ণণা পাওয়া যায় না । আর যেহেতু মূসার শরীয়তের এর অনুমতি ছিল এবং হযরত মসীহ নাসেরীর যুগে এর প্রচলন ছিল, এই কারণে তাদের নীরবতা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা এটিকে বৈধ মনে করতেন। অতএব ইসলাম নতুন কিছু উদ্ভাবন করে নি। কিন্তু ইসলাম একাধিক বিবাহের মাত্রা বেঁধে দিয়েছে এবং এমন শর্ত চাপিয়ে দিয়েছে যার ফলে ব্যক্তি ও জাতির জন্য কল্যাণময় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই নোটের শেষে একথার উল্লেখ করাও আবশ্যক যে, বিরোধীদের পক্ষ থেকে যদিও আঁ হযরত (সা.)-এর বিবাহ সম্পর্কে ঘোর আপত্তি করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের স্বভাব ও চিন্তাধারা অনুযায়ী তাঁর বহুবিবাহের বিষয়টি দেখেছে, কিন্তু তা সত্বেও বিরোধীদের কলম ও মুখ দিয়েও এর সত্যতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তারা সম্পূর্ণভাবে না হলেও অন্তত আংশিক সত্যকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। মি.মার্গোলিসও এই বিষয়ের তাৎপর্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, যিনি সাধারণত প্রত্যেক সোজা বিষয়কেও বক্র দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত। তিনি নিজের পুস্তক 'মহম্মদ'-এ লেখেন-

" মহম্মদ (সা.)-এর একাধিক বিবাহ যা খাদিজার পর সম্পন্ন হয়েছে, সেগুলি অধিকাংশ ইউরোপিয়ান লেখকদের নিকট কাম চরিতার্থ করার মাধ্যম বলে গণ্য হয়েছে, কিন্তু গভীরে গিয়ে চিন্তা করলে জানা যায় যে, সেগুলির অধিকাংশ আবেগতাড়িত সিদ্ধান্তের পরিণাম ছিল। মহম্মদ (সা.)-এর একাধিক বিবাহ ছিল জাতিগত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে । কেননা, মহম্মদ (সা.) চাইতেন নিজের বিশেষ বিশেষ সাহাবাদেরকে বিবাহের মাধ্যমে নিজের সঙ্গে ভালবাসার বন্ধন সুদৃঢ় করা। আবু বাক্কর ও উমরের কন্যাদেরকে বিবাহ নিঃসন্দেহে এই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে পরাজিত শত্রু ও সর্দারদের কন্যার সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিবাহ করেছেন। বাকী বিবাহগুলি তিনি এই উদ্দেশ্যে করেছিলেন যাতে তাঁর পুত্র সন্তান লাভ হয় যা তিনি ভীষণভাবে বাসনা করতেন।

(মার্গোলিস, পৃষ্ঠা: ১৭৬-১৭৭)

এটি সেই ব্যক্তির মতামত যে আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনী লেখকদের মধ্যে পক্ষপাত দুষ্ট হিসেবে প্রথম সারিতে অবস্থান করে। মার্গোস সাহেবের এই মতামত সম্পূর্ণরূপে ক্রুটিমুক্ত নয়। কিন্তু এর মাধ্যমে প্রমাণ অবশ্যই পাওয়া যায় যে, সত্য কিভাবে এক কলুষিত মনকেও জয় করতে পারে।

(সীরাত খাতামান নাবীঈন, পৃষ্ঠা: ৪৩২)

****

محمدؐ ہی نام اور محمدؐ ہی کام
علیک الصلوٰۃ علیک السلام

از حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ

بدر گاہِ ذی شان خیر الانام   شفیع الوریٰ مرجع خاص و عام
بصد عجز و منت بصد احترام   یہ کرتا ہے عرض آپؐ کا اِک غلام
کہ اے شاہِ کونین عالی مقام
علیک الصلوٰۃ علیک السلام

حسینانِ عالم ہوئے شرمگیں   جو دیکھا وہ حسن اور وہ نورِ جبیں
پھر اس پہ وہ اخلاق اکمل تریں   کہ دشمن بھی کہنے لگے آفریں
زہے خُلقِ کامل زہے حُسنِ تام
علیک الصلوٰۃ علیک السلام

خلائق کے دل تھے یقیں سے تہی   بتوں نے تھی حق کی جگہ گھیر لی
ضلالت تھی دُنیا پہ وہ چھا رہی   کہ توحید ڈھونڈے سے ملتی نہ تھی
ہوا آپؐ کے دم سے اس کا قیام
علیک الصلوٰۃ علیک السلام

محبت سے گھائل کیا آپؐ نے   دلائل سے قائل کیا آپؐ نے
جہالت کو زائل کیا آپؐ نے   شریعت کو کامل کیا آپؐ نے
بیاں کر دیئے سب حلال و حرام
علیک الصلوٰۃ علیک السلام

نبوت کے تھے جس قدر بھی کمال   وہ سب آپؐ میں جمع ہیں لامحال
صفاتِ جمال اور صفاتِ جلال   ہر اِک رنگ ہے بس عدیم المثال
لیا ظُلم کا عفو سے انتقام
علیک الصلوٰۃ علیک السلام

مقدس حیات اور مُطہر مذاق   اطاعت میں یکتا عبادت میں طاق
سوارِ جہاں گیر یکراں براق   کہ بگذشت از قصرِ نیلی رواق
محمدؐ ہی نام اور محمدؐ ہی کام
علیک الصلوٰۃ علیک السلام

علمدارِ عُشاقِ ذاتِ یگاں   سپہدارِ افواجِ قُدسیاں
معارف کا اِک قُلزمِ بیکراں   افاضات میں زندۂ جاوداں
پلا ساقیا آبِ کوثر کا جام
علیک الصلوٰۃ علیک السلام

ইমামের বাণী

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হচ্ছে, আঁ হযরত (সা.)-প্রতি আন্তরিক আনুগত্য এবং ভালবাসা মানুষকে অবশেষে খোদা তা'লার প্রিয় বান্দায় পরিণত করে (হাকীকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা: ৬৫)

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

এবং অন্ধকারপূর্ণ পথ থেকে মুক্তি দান করেছেন এবং তাদেরকে যাবতীয় প্রকারের কপটতা, ভেদাভেদ, কলহ-বিবাদ এবং দুষ্কৃতির গুণ থেকে পবিত্র করেছেন। এছাড়াও তিনি চক্ষুসমূহকে দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন, সন্দিগ্ধহীনতার সৃষ্টি করেছেন এবং বন্দীদের মুক্তি দিয়েছেন। এমনকি তিনি মানুষের মনে সমপর্ণ ও সন্তুষ্টির স্পৃহা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কুফরের আবেগকে প্রশমিত করেছেন এবং তাদেরকে অবিচলতা দান করেছেন।........ এবং নিজের পায়ে দাঁড় করিয়েছেন। তারা দেখতে আরম্ভ করে এবং নিজেদের পথ ও গন্তব্য দেখে নেয় এবং গন্তব্য ঠিক করে ফেলে এবং সুশীতল ও সুমিষ্ট পানির ঘাটে অবতরণ করে। তাদের পবিত্রকরণ করা হয় এবং তাদেরকে এমনভাবে পবিত্র করা হয় যে তারা মানবকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে অভিহিত হয়।

(কেরামাতুস সাদিকীন, উর্দু অনুবাদ: পৃষ্ঠা: ৫)

মহানবী (সাঃ) এর জীবনী-মক্কা বিজয়ের ঘটনার আলোকে

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) রচিত 'নবীয়োঁ কা সর্দার' পুস্তক থেকে উদ্ধৃত

অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে (ডিসেম্বর, ৬২৯ খৃঃ) হযরত রসূলে করীম (সা.) সেই চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন, যে যুদ্ধ আরবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে দিল। এই ঘটনা যেভাবে ঘটেছিল তা হচ্ছে, হোদায়বিয়ার সন্ধিতে এই ফায়সালা হয়েছিল যে, আরব গোত্রগুলির মধ্য থেকে যারা খুশী মক্কাবাসীদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে এবং যারা খুশী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে যোগ দিতে পারবে। এছাড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত এই ছিল যে, দশ বছরের মধ্যে উভয় পক্ষের কেউ কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। তবে হামলা চালিয়ে যদি সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ করে, তাহলে সেক্ষেত্রে উক্ত শর্ত কার্যকর থাকবে না। চুক্তি অনুসারে বনু বকর নামে আরবের একটি গোত্র মক্কাবাসীদের সঙ্গে যোগ দিল এবং খোজায়া নামক গোত্রটি যোগ দিল মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে। আরবের কাফেররা কোন চুক্তি রক্ষার ব্যাপারে খুব একটা তোয়াক্কা করত না, বিশেষতঃ সেই চুক্তি যদি মুসলমানদের সঙ্গে হয়। বনু বকর গোত্রের সঙ্গে খোজায়া গোত্রের বিরোধ চলে আসছিল বহুদিন ধরে। হোদায়বিয়ার সন্ধির কিছুদনি পরে তারা মক্কাবাসীদের সঙ্গে পরামর্শ করল যে, খোজায়া গোত্র তো চুক্তির বদৌলতে খুবই নিরাপদে আছে, এখন তাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করার সময় এসেছে। অতএব মক্কার কোরায়েশ এবং বনু বকর একসাথে জোটবদ্ধ হয়ে বনু খোজায়া গোত্রের উপর রাত্রি বেলায় চোরাপোক্ত হামলা চালিয়ে তাদের বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করল। খোজায়া গোত্র যখন জানতে পারল যে, কোরায়েশ বনু বকরের সাথে মিলে একত্রে হামলা চালিয়েছে, তখন তারা সেই চুক্তিভঙ্গে খবর জানাবার জন্য তৎক্ষণাৎ চল্লিশজন লোককে দ্রুতগামী উটে তুলে দিয়ে মদীনায় প্রেরণ করল এবং তারা রসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এই দাবী করে পাঠাল যে, চুক্তি মোতাবেক এখন আপনার কর্তব্য আমাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করা এবং মক্কা আক্রমণ করা। এই দাবী নিয়ে ঐ কাফেলা রসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে পৌঁছালে তিনি (সা.) তাদেরকে বললেন, তোমাদের দুঃখ আমাদের দুঃখ। আমি আমার অঙ্গিকারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। এই যে এখন বৃষ্টি হচ্ছে (ঐ সময় বৃষ্টি হচ্ছিল) এবং যা প্রবল বেগে বর্ষিত হচ্ছে, ঠিক এমনি দ্রুততার সঙ্গে ইসলামী সৈন্যরা তোমাদের সাহায্যের জন্য বর্ষিত হবে। মক্কাবাসীরা যখন খোজায়া প্রতিনিধি দলের এই খবর জানতে পারলো, তখন তারা খুব ভীত হয়ে পড়ল এবং তারা আবু সুফিয়ানকে মদীনায় প্রেরণ করলো যেন সে মুসলমানদেরকে যে কোনভাবেই হোক আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকতে সম্মত করে। আবু সুফিয়ান মদীনায় পৌঁছে রসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এই কথার উপর জোর দিতে লাগল যে, যেহেতু সে হোদায়াবিয়ার সন্ধির সময়ে উপস্থিত ছিল না, সেহেতু নতুন করে চুক্তি করতে হবে। কিন্তু ররসুলুল্লাহ (সা.) তার সেই কথার কোন জবাব দিলেন না। কেননা জবাব দিলেই বিষয়টা নিয়েই আলোচনা শুরু হয়ে যাবে। এতে আবু সুফিয়ান হতাশ হল এবং সে ঘাবড়ে গিয়ে মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিল, ' হে লোক সকল! আমি মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য নতুন করে শান্তির ঘোষণা দিচ্ছি।' এতে মুসলমানরা তার নির্বুদ্ধিতা দেখে হেসে উঠলো। রসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, ' আবু সুফিয়ান! এই কথা তো তুমি বলছ এক তরফা। আমি তো তোমাদের সঙ্গে নতুন কোন চুক্তি করি নি।

এই সময়ে রসুলুল্লাহ (সা.) চুতর্দিকে মুসলিম কাবিলাগুলির কাছে বার্তা পাঠিয়ে দিলেন। যখন এই খবরাদি এসে পৌঁছল যে, মুসলিম কবিলাগুলি তৈরী হয়ে গেছে এবং তাদের প্রত্যেকেই মার্চ করতে করতে এসে পথিমধ্যে মিলিত হতে থাকবে, তখন তিনি (সা.) মদীনাবাসীদেরকে অস্ত্রসজ্জিত হতে বললেন। ৬৩০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীতে এই সৈন্যবাহিনী মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেল এবং রাস্তার মধ্যে চতুর্দিক থেকে মুসলিম গোত্রগুলো একের পর এক এসে যোগদান করতে থাকল। কয়েক মঞ্জিল পথ অতিক্রম করার পর যখন এই সেনা বাহিনী ফারান মরুতে প্রবেশ করল, তখন তাদের সংখ্যা সোলাইমান নবীর (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী দশ হাজারে উন্নীত হল। এদিকে তো এই সৈন্যবাহিনী মক্কা অভিমুখে কুচকাওয়াজ করে অগ্রসর হচ্ছিল; অপরদিকে চারিদিকে বিরাজমান নীরবতা মক্কাবাসীর মনে উত্তরোত্তর ভীতির সঞ্চার করে চলেছিল। শেষে তারা পরামর্শ করে আবু সুফিয়ানে উপর এই চাপ সৃষ্টি করলো যে, তার উচিত অন্ততঃপক্ষে মক্কার বাইরে গিয়ে কিছু খোঁজ খবর নেওয়া যে, আসলে মুসলমানরা কি করতে চায়। আবু সুফিয়ান তখন মক্কা থেকে এক মঞ্জিল পথ অতিক্রম করে এসে দেখতে পেল যে, রাত্রিবেলায় মরুভূমিতে আগুন জ্বলছে। আর সেই আগুনের আলোতে মরুভূমি আলোকিত হয়ে উঠছে। রসুলুল্লাহ (সা.) হুকুম দিয়েছিলেন যে, সকল তাঁবুর সামনে যেন আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়। মরুভূমির মধ্যে দশ হাজার মানুষের জন্য তৈরী তাঁবুসমূহের সামনে প্রজ্জ্বলিত আগুন এক ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। আবু সুফিয়ান তার সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপার কি? আসমান থেকে সৈন্যবাহিনী নেমে এসেছে নাকি? আরবের কোন কওমের সেনাবাহিনী তো এত বড় হতে পারে না?' তার সঙ্গীরা বিভিন্ন গোত্রের কথা বলল। কিন্তু কে বলল, 'না, না, আরবের কোন গোত্রেরই সেনাবাহিনী এত বড় ও বিশাল হতে পারে না।' তারা যখন এইরূপ কথাবার্তা বলছিল, এমন সময়ে অন্ধকার বিদীর্ণ করে আওয়াজ এলো, 'আবু হানজালা! (আবু সুফিয়ানের ডাকনাম) '। আবু সুফিয়ান বলল, 'তুমি আব্বাস, এখানে কোথায়?' আব্বাস বললেন, 'মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.)-এর সৈন্যবাহিনী সামনেই শিবির স্থাপন করেছে। তোমরা যদি এখন শীঘ্র শীঘ্র একটা কিছু না কর, তাহলে তোমাদের জন্য পরাজয় ও অপমান প্রস্তুত হয়ে আছে। আব্বাস ছিলেন আবু সুফিয়ানের পুরোনো বন্ধু। তাই এই সব কথাবার্তার পর তিনি আবূ সুফিয়ানকে তাঁর উটের পিঠে চড়ে বসতে বললেন বরং তিনি তার হাত ধরে তাকে টেনে তুলে নিজের পাশেই বসালেন এবং উটের গায়ে এড়ি মারলেন এবং দ্রুত রসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকটে এসে উপস্থিত হলেন। হযরত আব্বাস (রা.) ভয় পাচ্ছিলেন যে, পাছে না উমর আবার তাকে দেখতে পেয়ে কতল করে ফেলে (উমর রা. সেই সময় পাহারারত ছিলেন)। কিন্তু রসুলুল্লাহ (সা.) আগেই বলে রেখেছিলেন, 'তোমাদের কারো সঙ্গে যদি আবু সুফিয়ানের সাক্ষাৎ হয়ে যায়, তাহলে তাকে হত্যা করবে না।'

এই সকল ঘটনাবলী আবু সুফিয়ানের মনে গভীর ভাবান্তর সৃষ্টি করল। আবু সুফিয়ান দেখতে পেল যে, মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে তারা আল্লাহ্‌র রসূলকে মাত্র একজন সঙ্গীসহ মক্কা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু আজ, মাত্র সাত বছর পার হতে না হতেই, তিনি দশহাজার পবিত্র সঙ্গীসহ কোন জুলুম, কোন জবরদস্তি ছাড়াই সম্পূর্ণ বৈধভাবে মক্কার দুয়ারে কড়া নাড়ছেন এবং মক্কাবাসীদের কোন শক্তি নেই যে, তাকে প্রতিহত করে। রসুলুল্লাহ (সা.)-এর সমীপে আসতে আবু সুফিয়ান এই জাতীয় চিন্তা ভাবনার কারণে এবং কিছু ভয়ভীতির কারণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। তার এই অবস্থা লক্ষ্য করে রসুলুল্লাহ (সা.) হযরত আব্বাসকে বললেন, 'তুমি আবু সুফিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে যাও এবং রাতে তোমার কাছেই রাখ। কাল ফজরে আমার কাছে নিয়ে এস।'

(সীরাত ইবনে হিশশাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৪, ১৯৩৬ সালে মিশরে প্রকাশিত সংস্করণ)

সুতরাং আবু সুফিয়ান রাত্রে আব্বাসের (রা.) সঙ্গেই থাকল। প্রত্যুষে যখন তাকে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকটে হাজির করা হলো, তখন ফজর নামাযের ওয়াক্ত। মক্কার লোকেরা ফজরের নামায পড়া সম্পর্কে কিছুই জানত না, আবু সুফিয়ান দেখলো যে, ফজরের ওয়াক্তে মুসলমানরা পানির লোটা নিয়ে এদিকে সেদিকে যাওয়া আসা করছে, কেউ অজু করছে, কেউ বা নামাযের জন্য কাতার (লাইন) সোজা করছে। সে মনে করল, তার জন্য বোধ হয় কোন নতুন ধরণের শাস্তির ব্যবস্থা হচ্ছে। কাজেই সে ভীত হয়ে হযরত আব্বাসকে জিজ্ঞেস করল, 'এই লোকগুলো এত ভোরে এসব কি করছে?' আব্বাস (রা.) বললেন, 'তোমার ভয়ের কারণ নেই, এরা নামায পড়ছে।' আবু সুফিয়ান দেখতে পেল যে, হাজার হাজার মুসলমান রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেছে এবং যখন তিনি রুকূ করলেন তখন সকলেই রুকূ করছে, যখন তিনি সিজদা করছেন তখন সকলেই সিজদা করছে। হযরত আব্বাস (রা.) যেহেতু পাহারারত ছিলেন সেহেতু তিনি নামাযে শামিল হতে পারেন নি। তাঁকে আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করল, 'এখন এরা কি করছে? আমি তো দেখছি, মুহাম্মদ (সা.) যা করছে, এরা সবাই তাই করছে।' আব্বাস (রা.) বললেন, 'তুমি অযথা কি ভাবছ? এরা তো নামায আদায় করছে। কিন্তু মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) যদি ওদেরকে হুকুম দেন, খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দাও, তাহলে তারা খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিবে।' আবু সুফিয়ান বললো, ' আমি খসরুর দরবার দেখেছি, আমি কায়সারের দরবার দেখেছি। কিন্তু আমি তাদের জন্য তাদের জাতিকে কখনও এত আত্মনিবেদিত দেখিনি, যত আত্মনিবেদিত আমি দেখতে পাচ্ছি মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর জাতিকে তার প্রতি'।

(সীরাতুল হুলবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯২, ১৯৩৬ সালে মিশরে প্রকাশিত সংস্করণ)

সে আবারও আব্বাসকে বললো, 'কেন এটা কি হতে পারে না যে, তুমি নিজেই তাঁর (সা.) কাছে এই আবেদন করো যে, তিনি যেন তাঁর জাতির প্রতি দয়ার সহিত ব্যবহার করেন?' নামায পড়া শেষ হয়ে গেলে হযরত আব্বাস আবু সুফিয়ানকে নিয়ে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। আঁ হযরত (সা.) বললেন, ' আবু সুফিয়ান! এখনও কি সময় আসেনি তোমার উপর সত্য প্রকাশিত হওয়ার যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই?' আবু সুফিয়ান বললো, 'আমার বাপ-মা তোমার জন্য কোরবান হউক, তুমি অতি বিনয়ী, অতি সম্ভ্রান্ত এবং অতিশয় শান্তি ও সমঝোতা প্রিয়, দয়াশীল মানুষ। আমি এখন তো এটা বুঝেছি যে, যদি আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য থাকতো, তাহলে সে আমাদের কিছু না কিছু সাহায্য করতো।'

রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, 'হে আবু সুফিয়ান! এখনও কি সময় আসে নি যে, তুমি এটা উপলব্ধি করো যে, আমি আল্লাহ্র রসূল?' আবু সুফিয়ান বললো, 'আমার বাপ-মা তোমার জন্যে কোরবানী হউক এ বিষয়ে এখনও আমার কিছু সন্দেহ আছে।'

কিন্তু আবু সুফিয়ান ইতস্ততঃ করলেও, তার সঙ্গে আসা (মুসলমানদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য) দুই ব্যক্তি উভয়েই মুসলমান হয়ে গেলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন হাকিম বিন হাযাম। এর পর আবু সুফিয়ানও মুসলমান হয়ে যান। তবে তাঁর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে খুলেছিল, সম্ভবতঃ মক্কা বিজয়ের পরে। ঈমান আনার পর হাকিম বিন হাযাম বললেন,

'ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি কি এই সৈন্যবাহিনী গঠন করেছেন নিজের জাতিকেই ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য? রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, 'ওরা জুলুম করেছে। ওরা পাপ করেছে। এবং তোমরা হোদায়াবিয়ায় সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করেছ এবং খোজায়া গোত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করেছ। তোমরা সেই পবিত্র স্থানে যুদ্ধ করেছ, যে স্থানে আল্লাহ্ শান্তি স্থাপন করেছেন।'

হাকিম বললেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ্! ঠিক কথা। আপনার জাতি নিঃসন্দেহে এসব করেছে। কিন্তু আপনার উচিত ছিল, মক্কার উপর আক্রমণ চালানোর পরিবর্তে হাওয়াযিন গোত্রের উপরে হামলা চালানো।'

রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, " ঐ গোত্রটি অত্যাচারী বটে, কিন্তু আমি আল্লাহ্র কাছে এই প্রত্যাশা রাখি যে, মক্কা বিজয়, ইসলামের বিজয় এবং হাওয়াযিনদের পরাজয়, এ সবকিছুই তিনি আমার হাতেই সম্পন্ন করবেন। এরপর আবু সুফিয়ান বললেন, ' ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সা.)! যদি মক্কার লোকেরা অস্ত্র ধারণ না করে, তাহলে কি ওরা নিরাপত্ত পাবে?

আঁ-হযরত (সা.) বললেন, ' হ্যাঁ, প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে, তাকে নিরাপত্তা দান করা হবে।'

হযরত আব্বাস বললেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ্! আবু সুফিয়ান গৌরব সম্ভ্রম পসন্দকারী ব্যক্তি। সে চাচ্ছে যে, তার মান-ইজ্জত রক্ষার ব্যাপারেও যেন একটা কিছু করা হয়।'

আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'খুব ভাল কথা! যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে তাকেও নিরাপত্তা দান করা হবে।

(সীরাত ইবনে হিশশাম, ৪র্খ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৫-৪৬ ১৯৩৬ সালে মিশরে প্রকাশিত সংস্করণ)

যে নিজের অস্ত্র পরিত্যাগ করবে তাকেও নিরাপত্তা দান করা হবে। যে হাকিম বিন হাযামের ঘরে আশ্রয় নেবে তাকেও নিরাপত্তা দান করা হবে।'

অতঃপর আবু রোয়াইহা (রা.) যাঁকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) আবিসিনিয়ার দাস বেলাল (রা.) এর ভাই করে দিয়েছিলেন, তাঁর সম্পর্কে বললেন, 'আমি এখন আবু রোয়াইহার হাতে আমার পতাকা দিব এবং যে ব্যক্তি আবু রোয়াইহার যে ব্যক্তি আবু রোয়াইহার ঐ পতাকা তলে আশ্রয় নেবে তাকেও কিছু বলা হবে না।'

এবং তিনি বেলাল (রা.)-কে বললেন, 'তুমি তার সাথে হাঁটতে থাক এবং এই ঘোষণা করতে থাক যে, যে ব্যক্তি আবু রোয়াইহার পতাকার তলে আশ্রয় নেবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে।'

(সীরাতুল হুলবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯৩, ১৯৩৬ সালে মিশরে প্রকাশিত সংস্করণ)

এই আদেশের মধ্যে নিহিত ছিল কত সূক্ষ্ম, কত সুন্দর হেকমত! মক্কার লোকেরা বেলাল (রা.)-র পাশে রশি বেঁধে তাকে মক্কার অলি গলিতে টেনে হিঁচড়ে বেড়াত। মক্কার অলিতে গলিতে মক্কার মাঠে-প্রান্তরে বেলাল (রা.)-র জন্য কোন নিরাপত্তার ঠাঁই ছিল না। ঠাঁই ছিল শুধু অত্যাচারের, উৎপীড়নের আর অপমানের। রসূলুল্লাহ্ (সা.) ভাবলেন, আজ তো বেলালের প্রাণ বারাবার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠবে। কাজেই আজ এই নিষ্ঠাবান প্রিয় সাথীটির জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এটাও ঠিক যে, আমাদের প্রতিশোধ হতে হবে ইসলামের মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই তিনি বেলালের প্রতিশোধ নিলেন, কিন্তু সে প্রতিশোধ এমনভাবে নিলেন না যে, তরবারী দিয়ে তাঁর (রা.) দুশমনের গর্দান কেটে ফেলা হল। বরং তিনি তাঁর ভাইয়ের হাতে পতাকা দিয়ে খাড়া করে দিলেন এবং বেলাল (রা.)-কে বললেন তিনি যেন ঘোষণা করতে থাকেন, 'যে কেউ আমার ভাইয়ের পতাকার তলে এসে আশ্রয় নেবে, তাকে নিরাপত্তা দান করা হবে। কত মধুর ও মহীয়ান ছিল এই প্রতিশোধ। যখন বেলাল (রা.) উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে থাকবেন,

'হে মক্কার অধিবাসীরা ! তোমরা এসো এবং আমার ভাইয়ের পতাকার তলে আশ্রয় গ্রহণ কর, তোমাদেরেকে নিরাপত্তা দান করা হবে।'

তখন তাঁর হৃদয় থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা আপনা আপনি প্রশমিত হয়ে যাবে এবং বেলালও (রা.) উপলব্ধি করেছিলেন, 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার জন্য যে প্রতিশোধ পন্থা ঠিক করেছেন, তার চাইতে মর্যাদাপূর্ণ, তার চাইতে উত্তম প্রতিশোধ আর কিছু হতে পারে না।

সৈন্যবাহিনী যখন মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করল রসূলে করীম (সা.) হযরত আব্বাস (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন, 'তুমি রাস্তার পার্শ্বে আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকো যেন ওরা ইসলামী সেনাবাহিনীর আনুগত্য ও আন্তরিকতা প্রত্যক্ষ করতে পারে।' হযরত আব্বাস (রা.) তাই করলেন। আবু সুফিয়ান ও তাঁর সঙ্গীদের সম্মুখ দিয়ে আরবের গোত্রগুলো একটার পর একটা অতিক্রম করে যেতে থাকলো। এই গোত্রগুলোর উপরেই মক্কা এক সময় নির্ভর করত। কিন্তু তারা আজ কুফরির পতাকা উড়াচ্ছে না। আজ তারা ইসলামের ঝাণ্ডা উড়ায়ে চলছে এবং তাদের মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহর একত্বের ঘোষণা। ওরা আজ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবন নেওয়ার জন্য অগ্রসর হচ্ছে না- যেমনটা আশা করতো মক্কাবাসীরা- বরং ওরা আজ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্

(সা.)-এর জন্য তাদের রক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে। এবং তাদের জীবনের শেষ ইচ্ছা এটাই যে, এক আল্লাহর তৌহিদ এবং তার প্রচারকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করবেই। একটার পর একটা ব্যাটেলিয়ান অতিক্রম করে যাচ্ছিল। এর সঙ্গে আশ্‌জাহ্ গোত্রের সেনাবাহিনীও ছিল। ইসলামের প্রতি ভালবাসা এবং তজ্জন্য অত্মবিসর্জন দেওয়ার উদ্দীপনা তাদের চেহারা এবং তাদের শ্লোগান থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। আবু সুফিয়ান বললেন, 'আব্বাস, এরা কারা? আব্বাস (রা.) বললেন, 'এরা আশ্‌জাহ্ কবিলার লোক।' আবু সুফিয়ান বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললেন, 'বলো কি! সারা আরবে তো এদের চেয়ে বড় দুশমন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর আর কেউ ছিল না।' আব্বাস (রা.) বললেন, 'এটা আল্লাহর মেহেরবানী। তিনি যখন চাইলেন, তখন ওদের হৃদয় ইসলামের ভালবাসা দিয়ে ভরপুর করে দিলেন।' সবশেষে মুহাজের ও আনসারদের গঠিত সেনাবাহিনী অতিক্রম করে গেলেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.)। এই বাহিনীতে সৈন্য ছিল দু'হাজার এবং এদের প্রত্যেকের মাথা থেকে পা যুদ্ধ সাজে সজ্জিত ছিল। হযরত উমর (রা.) এদের কাতার ঠিক করতে করতে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, 'ঠিক মত মার্চ করো, লাইন যেন সোজা থাকে।' সেই দীর্ঘদিনের, সেই ইসলামের ভালবাসা, সেই দৃঢ়চিত্ততা, সেই উদ্দীপনা তাদের চেহারা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। তাদেরকে যখন আবু সুফিয়ান দেখলেন, তখন তার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয়ে পড়লো। সে জিজ্ঞেস করলো, 'আব্বাস এরা কারা ? তিনি (রা.) বললেন, 'রসূলুল্লাহ্ (সা.) যাচ্ছেন আনসার এবং মুহাজেরদের সেনাবাহিনী নিয়ে।' আবু সুফিয়ান বললো আজ পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা এই সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করতে পারে।' সে হযরত আব্বাসকে সম্বোধন করে বললো, 'আব্বাস! তোমার ভাতিজা আজ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় বাদশাহ্।' আব্বাস বললেন, 'এখনও তোমার হৃদয়ের চোখ খুলেনি। এতো বাদশাহাত নয়, এতো নবুওয়ত।' আবু সুফিয়ান বললো, 'আরে, ঠিক আছে, ঠিক আছে নবুওয়তই মানলাম।'

(সীরাত ইবনে হিশশাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৭, ১৯৩৬ সালে মিশরে প্রকাশিত সংস্করণ)

এই সৈন্যবাহিনী এখন আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন আনসারদের কমাণ্ডার সায়দ বিন ওবাদা (রা.) আবু সুফিয়ানকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, আল্লাহ্ আজ তরবারীরর জোরে মক্কায় প্রবেশ বৈধ করে দিয়েছেন। আজ কোরেশ জাতিকে লাঞ্ছিত করা হবে।' রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছিলেন তখন সে উচ্চস্বরে বলতে লাগলো, 'ইয়া রসূলুল্লাহ্! আপনি কি আজ আপনার জাতিকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছেন ? এই কথাই যে বলে গেল একটু আগে আনসার সর্দার সায়দ ও তার সঙ্গীরা। তারা তো জোর গলায় বলে গেল যে, 'আজ লড়াই হবে এবং মক্কার মর্যাদা তাদেরকে যুদ্ধ করা তেকে বিরত রাখতে পারবে না। আজ তারা কোরেশদেরকে লাঞ্ছিত করেই ছাড়বে।' 'ইয়া রসূলুল্লাহ্ আপনি তো দুনিয়ার বুকে সবার উপরে পুণ্যময়, সব চাইতে বেশী দয়াময়, সর্বাপেক্ষা বড় শান্তিস্থাপনকারী মানুষ। আপনি কি আজ আপনার জাতির অত্যাচার ভুলে যেতে পারেন না ?' আবু সুফিয়ানের এই করুণ আবেদন শুনে মুহাজেরদের মনেও করুণার সঞ্চার হলো, যদিও একদা তাদেরকে মক্কার অলিতে-গলিতে নির্মমভাবে প্রহার করা হয়েছিল, অত্যাচার করা হয়েছিল, এবং তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকেও বিতাড়িত করা হয়েছিল, তাদের সহায় সম্পদ সব কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তবু তাঁরা বললেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সা.)! আনসাররা মক্কাবাসীদের অত্যাচারের সে সব কাহিনী শুনেছে, তার দরুন, জানিনা, ওরা আজ কোরেশদের সাথে কী ব্যবহার করে।' রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, 'আব সুফিয়ান! সায়াদ যা বলেছে, তা ঠিক নয় আজ তো দয়ার দিন। আজ তো আল্লাহতা'লা কোরেশ এবং খানা-এ-কাবাকে সম্মানিত করবেন।' অতঃপর তিনি সায়দ (রা.)-কে ডেকে আনলেন এবং তাঁকে বললেন, তোমার পতাকা তোমার ছেলে কায়েসের হাতে দাও। এখন তোমার জায়গায় সেই হবে আনসারদের কমাণ্ডার।

(সীরাতুল হুলবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯৫, ১৯৩৬ সালে মিশরে প্রকাশিত সংস্করণ)

এইভাবে তিনি মক্কাবাসীদের হৃদয়ে স্বস্তি দান করলেন এবং আনসারদের মনে কষ্ট পাওয়া থেকে রক্ষা করলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পূর্ণ আস্থা কায়েমের উপরে। কায়েস ছিলেন একজন খুব শরীফ নওজোয়ান, এমন শরীফ যে, ইতিহাসে লিখিত আছে, যখন কায়েসের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলো, তখন অনেকে তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের জন্যে এলেন, বহুলোক এলো না। এতে তিনি তাঁর বন্ধুদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি, অনেকে তো আমার সঙ্গে শেষ দেখাটাও করতে এলো না। বন্ধুরা বললেন, 'আপনি তো আসলে খুব উদার হৃদয়ের মানুষ। দুঃখ দৈন্যে পড়ে বহুলোক আপনার কাছে টাকা-পয়সা কর্জ নিয়েছে। বহুলোক আপনার কাছে ঋণী। তারা এজন্যই আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছে না পাছে আপনি আবার তাদের কাছে আপনার নিজ প্রয়োজনের সময় পাওনা টাকা চেয়ে বসেন।' কায়েস বললেন, 'তাহলে তো আমি নিজেই আমার বন্ধুদেরকে দূরে রাখার কারণ। আহা! বন্ধুরা আমার! তারা বিনা কারণেই কষ্ট পাচ্ছে। তোমরা আমার পক্ষ থেকে সারা শহরে ঘোষণা করে দাও যে, কায়েস যাদের কাছে টাকা-পয়সা পেতো, সে তাদের প্রত্যেককেই মাফ করে দিয়েছে। এই ঘোষণার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য এত লোক আসতে থাকলো যে, তাঁর ঘরের সিড়ি ভেঙ্গে পড়ে গেল।

(সীরাতুল হুলবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯৫, ১৯৩৬ সালে মিশরে প্রকাশিত সংস্করণ)

সমগ্র সৈন্যবাহিনী যখন চলে গেল, তখন আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ানকে বললেন, 'এখন তুমি তোমার সওয়ারীতে চেপে মক্কায় ছুটে যাও এবং সেখানে লোকেদেরকে বলে দাও যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.) এসে গেছেন এবং তিনি এই এই অবস্থায় মক্কাবাসীদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। আবু সুফিয়ান এই ভেবে আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তিনি মক্কাবাসীদের পরিত্রাণের একটা উপায় বের করতে পেরেছেন। কিন্তু স্ত্রী হিন্দা যে প্রথম থেকেই ইসলামের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করার জন্য অন্য সবাইকে বলতো ও উস্কানী দিত, যে কাফের হওয়া সত্ত্বেও একজন তেজস্বীণি স্ত্রীলোক ছিল, সে এগিয়ে গিয়ে তার স্বামীর দাড়ি ধরলো এবং মক্কাবাসীদের চিৎকার করে বলতে থাকলো, তোমরা এই আহাম্মকটাকে কতল করে ফেলো। সে কোথায় তোমাদেরকে বলবে, নিজেদের শহরের সম্মান রক্ষার জন্য যুদ্ধ করো, প্রয়োজন হলে জীবন দাও। তা না করে তোমাদেরকে শোনাচ্ছে কিনা নিরাপত্তার ঘোষণা।' আবুসুফিয়ান তাকে বললেন, 'নাদান মেয়েলোক! এই কথা বলার সময় এটা নয়। ভালাই চাও তো, এখন নিজের ঘরে গিয়ে লুকাও। আমি নিজে এই সেনাবাহিনীকে দেখে এসেছি, যার মোকাবেলা করার ক্ষমতা সারা আরবের নেই।'

অতঃপর আবু সুফিয়ান উচ্চ আওয়াজে নিরাপত্তার শব্দগুলো উচ্চারণ করতে লাগলেন এবং লোকেরা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজ নিজ ঘরের দিকে দৌড়াতে লাগলো।

(সীরাত ইবনে হিশশাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৭, ১৯৩৬ সালে মিশরে প্রকাশিত সংস্করণ)

যাদের ক্ষেত্রে এই নিরাপত্তা প্রযোজ্য ছিল না, তাদের সংখ্যা পুরুষ এগারো জন এবং নারী চার জন। যাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারমূলক হত্যা ও ফ্যাসাদের প্রমাণিত অভিযোগ ছিল এবং তারা যুদ্ধাপরাধীও ছিল। এদের সঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ ছিল যে, এদের মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। কেননা, এরা যে অবিশ্বাসের কারণে লড়াই করার অপরাধে অপরাধী ছিল তা নয় বরং এরা যুদ্ধাপরাধী ছিল। এই পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) খালেদ বিন ওলীদ (রা.)-কে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি যুদ্ধ করে, তুমিও যুদ্ধ করতে পারবে না।' কিন্তু যে দিক দিয়ে খালেদ শহরে প্রবেশ করছিলেন, ঐ সৈন্যদল খালেদের মোকাবেলা করার জন্য এগিয়ে এল। সংঘর্ষে চব্বিশজন লোক নিহত হলো। কোন কোন বর্ণনামতে নিহতের সংখ্যা ছিল বার/তেরোজন (হিসাম)। যেহেতু খালেদের স্বভার ছিল দারুন তেজস্বী, সেহেতু এক ব্যক্তি দৌড়ে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.) -কে খবর দিল এবং এই আবেদন জানালো যে,খালেদকে থামানো হোক। নইলে সে আজ সকল মক্কাবাসীকেই মেরে ফেলবে। আঁ হযরত (সা.) তৎক্ষণাৎ খালেদকে ডেকে পাঠালেন। খালেদ এলে তিনি তাঁকে বললেন, 'কেন, আমি কি তোমাকে বারণ করিনি যুদ্ধ করতে?'

খালেদ (রা.) বললেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ্! আপনি বারণ তো করেছিলেন। কিন্তু ওরাই তো প্রথমে

আমার উপরে হামলা চালালো। আমি অনেকক্ষণ ধরে নানাভাবে তাদেরকে থামানোর চেষ্টা করেছি এবং আমি তাদেরকে বারবার বলেছি যে, আমরা তোমাদেরকে আক্রমণ করতে আসিনি। তোমরা হামলা বন্ধ করো, তোমরা এমন করো না। কিন্তু যখন দেখলাম যে, তারা কিছুতেই নিরস্ত হচ্ছে না, তখন আমি বাধ্য হয়ে তাদের সঙ্গে লড়াই করেছি এবং আল্লাহ্ ওদেরকে চতুর্দিকে বিফল করে দিয়েছেন।'

(সীরাতুল হুলবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯৭, ১৯৩৫ সালে মিশরে প্রকাশিত সংস্করণ)

যাহোক এই ঘটনাটি ছাড়া এ ধরনের আর কোনও ঘটনা ঘটেনি। মক্কানগরী পুরোপুরি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দখলে এসে গেল। যখন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন শহরের লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো,

'ইয়া রসূলুল্লাহ্! আপনি কি আপনার ঘরেই থাকবেন ?' তিনি (সা.) বললেন,

'আকেল (তাঁর চাচাত ভাই) কি আমার জন্য কোন ঘর রেখেছে। হিজরতের পর আমার সহায়-সম্পত্তি তো আমার আত্মীয়-স্বজনেরা সব বেচে ছেঁচে শেষ করে দিয়েছে। এখন মক্কায় তো আমার ঠিকানা নেই।'

অতঃপর তিনি বললেন, 'আমি খায়েফ বনী খেনানাতে থকবো।' এই স্থান ছিল মক্কার একটি ময়দান। যেখানে কোরেশ এবং কেননা গোত্র একত্রে মিলিত হয়ে শপথ গ্রহণ করেছিল, 'যতদিন বনু হাশেম ও বনু মুত্তালেব মুহাম্মদ (সা.)-কে গ্রেফতার করে আমাদের হাতে সোপর্দ করবে না এবং তাকে পরিত্যাগ করবে না, ততদিন পর্যন্ত আমরা তাদের সঙ্গে কোন বিয়ে শাদী করবো না, বেচা-কেনা, লেনদেন করবো না।' এই শপথ গ্রহণের পর, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চাচা আবু তালিব এবং তাঁর (সা.) জামাতের সকল লোক আবু তালিব উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং তিন বছর ধরে দুঃসহ দুঃখ যাতনা ভোগ করার পর খোদাতা'লা তাঁদেরকে মুক্ত করেন।

এই স্থানটিকে আশ্রয়ের জন্য নির্ধারণ করাটা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মক্কাবাসীরা এই স্থানেই শপথ গ্রহণ করেছিল যে, যতক্ষণ না মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে তাদের হাতে সোপর্দ করা হবে, ততক্ষণ তারা তাঁর কবিলার সঙ্গে কোন প্রকার সমঝোতা করবে না। আজ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.) সেই ময়দানেই এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং যেন মক্কাবাসীদেরকে বলছেন, 'যেখানে তোমরা আমাকে চাচ্ছিলে, আমি সেখানেই এসে হাজির হয়েছি। কিন্তু বলতো সত্যি করে যে, তোমাদের কি আজ সেই শক্তি আছে যার জোরে তোমরা আমাকে আজ তোমাদের সেইসব জুলুমের নিশানা বানাতে পার ? এই সেই স্থান যেখানে তোমরা আমাকে লাঞ্ছিত করে ঘৃণ্য চেহারায় দেখতে চেয়েছিলে এবং ইচ্ছা করেছিলে যে, আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে গ্রেফতার করে তোমাদের হাতে তুলে দিবে। সেখানে আমি আজ এমন চেহারায় এসেছি যে, শুধু আমার গোত্রই নয়, বরং সারা আরব আজ আমার সাথে রয়েছে এবং আমার কওম তখন আমাকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করেনি বরং আমার কওম আজ তোমাদেরকে সোপর্দ করে দিয়েছে আমার হাতে।'

আল্লাহতা'লার কুদরতে ঐ দিনটি ছিল সোমবার এবং এক সোমবারেই মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.) সওর গিরিগুহা থেকে বের হয়ে একমাত্র সঙ্গী আবু বকর (রা.)-কে নিয়ে মদীনার পথে হিজরত করেছিলেন এবং এই সোমবারেই তিনি (সা.) সওর গিরিচূড়া থেকে মক্কার প্রতি তাকিয়ে বলেছিলেন ঃ

'হে মক্কা! তুমি আমার কাছে দুনিয়ার কাছে দুনিয়ার সকল স্থানের চাইতে প্রিয়। কিন্তু তোমার অধিবাসীরা আমাকে এখানে থাকতে দিচ্ছে না।'

(সীরাতুল হুলবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৭, ১৯৩৬ সালে মিশরে প্রকাশিত সংস্করণ)

মক্কায় প্রবেশের সময় হযরত আবুবকর (রা.) রসূলে পাক (সা.)-এর উটনীর রেকাব ধরে তাঁর সাথে কথা বরতে বলতে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং সূরা ফাত্হ, যার মধ্যে মক্কা বিজয়ের খবর দেওয়া হয়েছিল, তা তেলাওয়াত করছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) সোজা কাবাঘরের দিকে গেলেন এবং উটনীর উপরে বসে থেকেই সাতবার কাবাঘর তওয়াফ করলেন। এই সময়ে তাঁর হাতে একটি ছড়ি ছিল। কাবাঘর যা নির্মাণ করেছিলেন নতুন করে হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ.) এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য, তার ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে যে তিন শ' ষাটটি দেবতার মূর্তি স্থাপন করা ছিল, সেগুলোর একটার পর একটার উপরে ছড়ি মারতে মারতে ঘুরছিলেন এবং বলছিলেন

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ
اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا-

(সীরাত ইবনে হিশশাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৯, ১৯৩৬ সালে মিশরে প্রকাশিত সংস্করণ)

এটি হচ্ছে কোরআন করীমের সেই আয়াত যা সূরা বনী ইসরাঈলে আঁ হযরত (সা.)-এর উপরে নাযিল হয়েছিল হিজরতের খবর ও মক্কা বিজয়ের খবর। ইউরোপীয়ান লেখকরাও এ বিষয়ে একমত যে, এই সূরা হিজরতের পূর্ববর্তী এবং এতে পূর্বেই বলা হয়েছিল

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِیْ
مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ
وَّاجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا ۝
وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ
الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۝

অর্থাৎ, তুমি বল, 'হে আমার প্রভু! আমাকে এই শহরে (মক্কাতে) মঙ্গলমত প্রবেশ করাইও হিজরতের পরে বিজয় ও প্রাধান্য দিয়ে, এবং এই শহর থেকে আমাকে মঙ্গলমত বের করিও হিজরতের সময়ে এবং তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে প্রাধান্য ও সাহায্যসহ সব প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রেরণ করিও।' এবং একথাও তুমি বল, 'সত্য এসেছে এবং বাতিল বা শিরকের জন্য পরাজিত হওয়া তো সব সময়ের জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে।' এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন হতে দেখে এবং সেই সঙ্গে আবুবকর (রা.)-কে সেই সব বাণী তেলাওয়াত করতে দেখে সে সময়ে মুসলমানদের এবং কাফেরদেরও মনে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ ঐ দিনেই ইব্রাহীমের মোকাম পুনরায় এক আল্লাহর এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলো। যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) হোবল দেবতার মূর্তির উপরে তাঁর ছড়ি দিয়ে আঘাত করলেন এবং মূর্তিটি পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল, তখন হযরত যোবায়ের (রা.) আবু সুফিয়ানের দিকে মুচকি হেসে তাকালেন এবং বললেন,

আবু সুফিয়ান, মনে আছে, ওহোদের দিনে যখন মুসলমানরা জখমে জখমে জর্জরিত হয়ে একদিকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তুমি তোমাদের অহংকারে শ্লোগান দিয়েছিলে 'উলো হোবল! উলো হোবল!' (হোবলের মহিমা বুলন্দ্ হোক, হোবলের মহিমা বুলন্দ্ হোক) এবং তুমি সেদিন হোবলকে মুসলমানদের উপর বিজয়ী বলে ঘোষণা করেছিলে। আজ দেখতে পাচ্ছ, হোবল খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে সামনে পড়ে আছে ?'

আবু সুফিয়ান বললেন, 'জোবায়ের, ছেড়ে দাও, এসব কথা! আমি ঠিকই দেখতে পাচ্ছি, যদি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খোদা ছাড়া অন্য খোদা থাকতোই, তাহলে আমি আজ যা দেখতে পাচ্ছি, তা কখনই হতো না।'

(সীরাতুল হুলবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯৯, ১৯৩৫ সালে মিশরে প্রকাশিত সংস্করণ)

অতঃপর আঁ হযরত (সা.) কাবাঘরের ভিতরে ইব্রাহীম (আ.) ও অন্যান্য নবীগণের যে সকল ছবি ছিল, তা সবই মুছে ফেলার হুকুম দিলেন এবং কাবাঘরের ভিতরেই খোদাতা'লার প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ হওয়ার জন্য দু'রাকাত নামায পড়লেন। কাবাঘরের ছবিগুলো মুছে ফেলার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিয়োজিত করেছিলেন হযরত উমর (রা.)-কে। 'ইব্রাহীম (আ.)-কে আমরা তো নবী হিসেবে মানি'- এই ধারণার বশবর্তী হয়ে উমর (রা.) ইব্রাহীম (আ.)-এর ছবিটি মুছলেন না; রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন দেখলেন যে, ছবিটি যথাস্থানেই আছে, তখন তিনি বললেন, 'উমর! তুমি এটা কি করেছ ? খোদা কি একথা বলেননি যে,

مَا كَانَ اِبْرٰهِیْمُ یَهُوْدِیًّا وَّلَا نَصْرَانِیًّا وَّلٰكِنْ
كَانَ حَنِیْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ

(সীরাতুল হুলবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০০, ১৯৩৫ সালে মিশরে প্রকাশিত সংস্করণ)

ইব্রাহীম তো না ছিল ইহুদী, না নাসারা। বরং সে ছিল খোদাতা'লার নিকটে একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং খোদাতা'লার সত্যতাকে মান্যকারী এবং খোদাতা'লার একত্ববাদী বান্দা এবং সে মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৬৮) অতএব তাঁর (সা.) নির্দেশ অনুযায়ী এই ছবিটিও মুছে ফেলা হল।

খোদাতা'লার নিদর্শনাবলী দেখে সেদিন মুসলমানদের হৃদয় এমনভাবে আপ্লুত হয়ে উঠেছিল এবং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-

২৪এর পাতায়

দাওয়াতে ইলাল্লাহ্: সীরাত আঁ হযরত (সা.)

ভাষণ: জলসা সালনা কাদিয়ান: ২০১৭, বক্তা: মহম্মদ ইনাম গৌরী, নাযির আলা কাদিয়ান

অনুবাদ: জাহিরুল হাসান (মুবাল্লিগ সিলসিলা)

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ○ وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ○

(الاحزاب:46تا47)

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ○ (المائدہ:68)

সূরা মায়েদা: ৬৮

অনুবাদ : হে নবী ! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি এক সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও তর্ককারী রূপে এবং আল্লাহর দিকে তাঁর আদেশে এক আহ্বানকারী ও দীপ্তিমান সূর্যরূপে।

হে রসূল! তোমার প্রভু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা (মানুষের কাছে ভালোভাবে) পৌঁছে দাও। আর তুমি তা না করলে তুমি (যেন) তাঁর বাণী পৌঁছানোর দায়িত্বই পালন করলে না। আর আল্লাহ্ তোমাকে মানুষের (কবল) থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অস্বীকারকারীদের হেদায়াত দেন না।

আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে পৃথিবীর চতুর্দিকে অন্ধকার ও বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। কোরআন করীম এটি ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ এই ভাষায় চিত্রায়িত করেছে (সূরা আর রুম: ৩০) ।

অর্থাৎ কিতাবধারী এবং অকিতাবধারী দুয়ের মধ্যে প্রকাশ্যে অশান্তি শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে আরব ভূখণ্ড সার্বিকভাবে চারিত্রিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে চরম অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতির মধ্যে দিনাতিপাত করছিল যেখানে ভালোমন্দের এবং কালো সাদার মধ্যে কোন পার্থক্য অবশিষ্ট ছিল না। এমনকি খানা কাবা যা কিনা শুরু থেকে এক আল্লাহর উপাসনা গৃহরূপে নির্মিত হয়েছিল সেখানে দৈনিক আলাদা আলাদা প্রতিমার উপাসনা করার জন্য ৩৬০টি প্রতিমা রেখে দেওয়া হয়েছিল। অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, খুন, সংঘর্ষ, রাহাজানি মদ্যপান ও ধর্ষণ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবং আরব জাতি যা কিনা কয়েকটি গোত্রের সমষ্ঠিগত গোষ্ঠির নাম ছিল, কখনই কোন সরকার অথবা আইনের প্রতি আনুগত্যশীল বা আস্থাশীল ছিল না।

সেই অন্ধাকর যুগে এক ব্যথিত হৃদয় ছিল যে নিজ জাতির অপকর্ম ও পথভ্রষ্টতাকে উপলব্ধি করে ব্যথিত হয়েছিল। একটি আত্মা যা ঐশী জ্যোতির জন্য আকুল হয়েছিল, এক পঁচিশ ত্রিশ বছরের যুবক যে এই অস্থিরতায় নিমজ্জিত হয়ে শান্তির সন্ধানে মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে হেরা পাহাড়ের পাদদেশে একটি গুহাকে আপন প্রভুর সান্নিধ্যলাভের জন্য আশ্রয় বানিয়ে নিয়েছিল। এবং সুদীর্ঘ পনেরো বছর ধরে দিনের পর দিন সেখানে উপস্থিত থেকে একাকী মনে দিনরাত প্রার্থনা করে গেছে। ইনিই হলেন আমাদের প্রভু ও মানব জাতির মুক্তিদাতা দয়ার সাগর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।

পরিশেষে আল্লাহতা'লা তাঁর প্রার্থনাকে গ্রহণীয়তার মর্যদা দান করেন এবং পবিত্র আত্মা হযরত জিব্রাঈল আমীনকে আপন পবিত্র বাক্যের সঙ্গে তাঁর নিকটে প্রেরণ করেন। তাঁর সত্যিকার প্রেমিক হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) এক জায়গায় বলেন

" নূর লায়ে আসমাঁ সে খুদ ভি এক নূর থে,

কওমে ওহসি মে আগার প্যায়দা হুয়ে কেয়া জায়ে আর"

অনুবাদ: আসমান হতে জ্যোতি অবতীর্ণ করেছেন তিনি স্বয়ং এক মহাজ্যোতি ছিলেন। অজ্ঞ জাতির মধ্যে জন্মানোতে কি এসে যায়।

এই আসমানি জ্যোতির দ্বারা অন্ধকারকে আলোকিত এবং অন্ধকারে নিমজ্জিত মানব জাতিকে আলোর মিনারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সাঃ) এখন কোরআন করীমের প্রত্যেকটা নাযিলকৃত আয়াত জাতিকে শোনাতে হবে, লেখাতে হবে এবং তাদের স্মৃতিতে ধারণ করাতে হবে আর কোরআনের প্রত্যেকটা নির্দেশের উপর স্বয়ং আমল করে দেখাতে হবে। যদি তুমি এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে না পার সেক্ষেত্রে নবুওয়তের মর্যাদা তুমি রক্ষা করতে পারলে না। এটা সাধারণ কোন দায়িত্ব ছিল না। আল্লাহতা'লা পবিত্র কোরআন করীমের অপর একটি আয়াতে বলেছেন যে, আমার এই পরিপূর্ণ বিধানের বোঝা ওঠানোর জন্য আসমান, জমিন এবং পাহাড়কে উৎসাহিত করেছিলাম।

فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا

(আল্ আহ্যাব:৭৩)

এরা প্রত্যেকেই অস্বীকার করে এবং এই আমানতের বোঝা বহন করার ক্ষেত্রে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ অর্থাৎ একজন পরিপূর্ণ মানব এই আমানতকে নিজের উপর ধারণ করে কেননা তিনি অজ্ঞতা ও নির্দয়তার গুণ থেকে পবিত্র ছিলেন। প্রতিটি পদক্ষেপ তিনি তোয়াক্কা না করে এই পথে আগত দুঃখ যাতনা বরণ করার এবং এই দুঃখ দুর্দশাকে আল্লাহতা'লার খাতিরে ভুলতে পারার অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

আঁহযরত (সাঃ) এর সারাজীবন দাওয়াতে ইলাল্লাহর এই দুর্গম সফর যা সাফা পাহাড়ে কুরায়েশ জাতিকে ঐশী বার্তা পৌঁছানোর মাধ্যমে শুরু হয়েছিল তা বিদায় হজ্জে আরাফাতের ময়দানে প্রদত্ত শেষ ভাষণ অবধি অব্যাহত ছিল। মক্কার তেরো বছর আর মদিনায় অবস্থানের দশ বছর এই তেইশ বছর সময়কালের এক একটা দিন সাক্ষী যে, হে আল্লাহর প্রিয়তম তুমি দাওয়াতে ইলাল্লাহর অঙ্গীকার যথার্থ রক্ষা করেছ।

এ বিষয়ে কয়েকটি ঘটনা আঁহযরত (সাঃ) এর পবিত্র জীবনপঞ্জি থেকে এখন উপস্থাপন করব। তাঁর তবলীগ এবং দাওয়াতে ইলাল্লাহর পদ্ধতি কোরআনী নির্দেশনা

اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

(আন্ নাহল:১২৬)

র উৎকৃষ্ট ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত ছিল।

হযরত আমরো বিন আম্বাসা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নবুওয়তের মর্যাদা লাভের প্রাথমিক দিনগুলিতে মক্কায় আসি। তখনও পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ নবুওয়তের সার্বজনীন ঘোষণা করেননি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম নবী কি? রসূলুল্লাহ্ বললেন আল্লাহতা'লার প্রেরিত পুরুষ নবী হয়ে থাকে আমি বললাম আল্লাহ্ কি আপনাকে প্রেরণ করেছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ। আমি বললাম যে, কি শিক্ষা দিয়ে প্রেরণ করেছেন? তিনি বললেন যে, আল্লাহতা'লার ইবাদত করতে হবে, প্রতিমাগুলিকে পরিত্যাগ করতে হবে এবং রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় স্বজনদের অধিকার প্রদান করতে হবে। আমি বললাম যে, এ তো খুবই সুন্দর শিক্ষা। কতজন লোক এটি গ্রহণ করেছে? তিনি বললেন যে, একজন স্বাধীন এবং একজন গোলাম (অর্থাৎ আবুবকর ও যায়েদ)। আমরো ইসলাম গ্রহণ করে নেন। তিনি বলেন যে, এরপর আমি রসূলুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করি ইয়া রসূলুল্লাহ, আমি কি এখানে অবস্থান করে আপনার আজ্ঞা পালন করতে থাকবো? তিনি বললেন যে, না তুমি স্বজাতির মধ্যে ফিরে এই শিক্ষার উপর আমল কর। হ্যাঁ যখন তুমি আমার হিজরতের ব্যাপারে জানবে তখন এসে আমার অনুবর্তিতা কর"। (বাইহাকী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৯)

এখানে প্রনিধানযোগ্য বিষয় যে, প্রাথমিক যুগের তবলীগে ক্রমোন্নতীর বিষয়টি দৃশ্যমান হয়। প্রথমদিকে শুধুমাত্র একত্ববাদ ও নবুওয়তের মৌখিক স্বীকারোক্তি করানো হয়েছিল এবং মানবাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে করুণা প্রদর্শনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে যেমন যেমন ঐশী নির্দেশনা আসতে থাকে সেগুলির প্রতি তাদের আহ্বান জানানো হয়।

এইভাবে প্রাথমিক যুগের ব্যক্তিগত তবলীগের ধারা অব্যাহত ছিল এবং তাও প্রকাশ্যভাবে নয় বরং গোপনীয়তার সাথে। হযরত

আবুবকর যিনি প্রাথমিক যুগে ঈমান এনেছিলেন তিনিও তাঁর জাতির বিশ্বাসযোগ্য লোকেদের নিকট সত্য বাণী পৌঁছানো শুরু করলেন। এভাবে একটি বাতি দ্বারা অন্যান্য বাতিগুলিও উদ্ভাসিত হতে লাগলো। নবুওয়তের দাবির তিন বছর পরে আল্লাহতা'লা তাঁকে নির্দেশ, দিলেন যে

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

(সূরা হিজর : ৯৫)

অনুবাদ: অতএব তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা তুমি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর এবং মুশরেকদের উপেক্ষা কর।

এর সাথে এই আজ্ঞাও হয় যে, এই প্রকাশ্য আহ্বানের শুরু নিজের আত্মীয়স্বজনদের মাধ্যমে যেন করা হয়। وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

(সূরা শোআরা : ২১৫) আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয় স্বজনদের সতর্ক কর।

এজন্য তিনি এই পদ্ধতি অবলম্বন করলেন, সকালে সাফা পাহাড়ে আরোহন করে উচ্চস্বরে কুরায়েশদের গোষ্ঠিগুলিকে আহ্বান জানালেন যে, হে আব্দুল মোত্তালেবের সন্তানগণ! হে আবদে মুনাফের সন্তানগণ! হে কাসার সন্তানগণ! ইত্যাদি (আরবে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে যখনই বিপদ সঙ্কুল পরিস্থিতিতে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা হত এইভাবে উঁচুস্থানে চড়ে ঘোষণা দেওয়া হত) যাইহোক, যখনই বিভিন্ন গোষ্ঠির সদস্যেরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ এর ঘোষণা শুনলেন তারা সাফা পাহাড়ের নিকটে একত্রিত হলেন। আঁহযরত (সাঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন! আমি একজন সতর্ককারী মাত্র। আমার এবং তোমাদের উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায় যারা এক আক্রমণকারী শত্রুকে প্রত্যক্ষ করে নিজের পরিবারকে সাবধান করছে কিন্তু সে এই চিন্তাও করে যে তারা তার কথা অমান্য করবে এবং উচ্চস্বরে সাহায্যের জন্য আবেদন করবে।"

এবং আরোও বললেন যে, এই পাহাড়ের পিছনে একটি সৈন্যদল তোমাদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত তবে কি তোমরা আমার কথার সত্যায়ন করবে? তারা সমস্বরে বলল কেন নয়। আজ অবধি আপনার পক্ষ হতে আমাদের কোন মিথ্যার অভিজ্ঞতা হয়নি। আমরা সব সময় আপনাকে সত্য পেয়েছি। তখন রসূলুল্লাহ বললেন আমি তোমাদেরকে তার আযাব থেকে সাবধান করছি এবং তার দিকে আহ্বান করছি। একথা শোনামাত্র আবুজেহেল تَبًّا لَكَ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا (তাব্বাললাকা আলি হাযা জামাতানা) হে মুহাম্মদ তুমি ধ্বংস হও। তুমি কি এইজন্য আমাদেরকে একত্রিত করেছ বলতে বলতে দাঁড়িয়ে পড়ে, তখন বাকী সবাইও ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

(বুখারী কিতাবুততফসীর)

আবার নিজের আত্মীয় স্বজনদের তবলীগ করার জন্য আঁহযরত (সাঃ) প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা এটা করেছিলেন যে, তাদেরকে যেন খাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আহ্বান করা হয় এবং সেই সুযোগে তাদের নিকট ঐশী বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়। সেই মত হযরত আলী ছাগলের তরকারী এবং রুটি তৈরী করিয়ে বনু মোত্তালেব বংশের কমপক্ষে চল্লিশ জনকে আমন্ত্রণ জানায় যাদের মধ্যে আঁহযরত (সাঃ) এর চাচা আবুতালেব, হামযা, আব্বাস আর আবুলাহাব ও শামিল ছিল। পানাহারের পর যখন আঁহযরত (সাঃ) কথা বলতে শুরু করলেন সেই মুহূর্তে আবুলাহাব শোরগোল করে দেয় যে, তোমাকে কেউ যাদুতে আচ্ছন্ন করেছে। একথা শোনামাত্র বাকী সব লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

আঁহযরত (সা) পুনরায় হযরত আলীকে দাওয়াতের ব্যবস্থা করতে বলেন। সেইমতো পুনরায় দাওয়াতের ব্যবস্থা করে সেই আত্মীয় স্বজনদের আবারও আমন্ত্রণ জানানো হয়। এবং আঁহযরত (সাঃ) বক্তব্য পরিবেশন করেন যে, হে আব্দুল মোত্তালেবের সন্তানগণ! খোদার কসম কোন আরব যুবক নিজের জাতির জন্য এর থেকে উন্নত ও উত্তম বার্তা নিয়ে আসেনি। আমি তোমাদের নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ বয়ে নিয়ে এসেছি। আমাকে আল্লাহতা'লা এ আদেশ দিয়েছেন যে, আমি তোমাদেরকে তার দিকে আহ্বান করি। সুতরাং এই ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে কে আমার সাহায্যকারী হবে? সবাই নীরব হয়ে যায়। কিন্তু একজন কিশোর হযরত আলী দন্ডায়মান হয় এবং নিবেদন করে যে, হে আল্লাহর নবী আমি আছি, কিন্তু বাকী লোকেরা অট্টহাস্য করে উঠে চলে যায়।

(তফসীর তিবরী সূরাতুল শোআরা, ৯ম খন্ড , পৃষ্ঠা : ৪৮১, প্রকাশ স্থান বেরুত)

যাইহোক এখনও অবধি এইভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বেশি বেশি পরিবারের লোককে একত্রিত করে বার্তা পৌঁছানোর প্রচেষ্টা করা হচ্ছিল। কিন্তু এখন স্থায়ী ঠিকানার প্রয়োজন উপলব্ধি হওয়া শুরু হল যেখানে নব দিক্ষীত মুসলিমরা একত্রিত হয়ে একে অপরের পরিচিতি লাভ করবে। সেইমত হযরত আরকাম বিন আরকাম (রাঃ) যিনি একাদশতম নম্বরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যার বাড়ী সাফা পাহাড়ের কোলে অবস্থিত ছিল তিনি এই বাড়ীটি উৎসর্গ করে দেন, যা মুসলমানদের প্রথম তবলীগি প্রচারকেন্দ্র হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। এই বাড়ীতেই হযরত উমর (রাঃ) যিনি আঁহযরত (সাঃ)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে ছিলেন, পথিমধ্যে নিজের বোন এবং ভগ্নিপতি যারা ইতিমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের সঙ্গে বিবাদ করে, তারপর সেখানে কোরআন করীমের 'সূরা ত্বাহা' এর কিয়দংশ তেলাওয়াত শোনার পর হৃদয় এমনই বিগলিত হয় যে, তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা দ্বার-এ আরকাম এসে উপস্থিত হন। এবং আঁহযরত (সাঃ)এর হাতে দীক্ষা গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যান। যেহেতু হযরত উমর একজন প্রভাবশালী এবং অভিজাত ব্যক্তি ছিলেন তাই তার মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর বাকী মুসলমানরা নির্ভয়ে নারা তকবীর ধ্বনী প্রতিষ্ঠিত করে এবং এর পরবর্তীতে প্রকাশ্যে তবলীগ শুরু করে দেয়।

(আসসীরাতুল নবুইয়্যাতুল ইবনে হিসসাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৪৩, প্রকাশ স্থান বেরুত)

এখন প্রকাশ্য তবলীগের ফলস্বরূপ এক এক দুই দুই করে কিছু স্বাধীন এবং কৃতদাস মুসলমান হতে শুরু করে। এখন একটা জামাতকে সংঘবদ্ধ হওয়া শুরু হতে দেখে মক্কার কুরায়েশদের নিজেদের আধিপত্য এখন বিপদের মধ্যে দেখে। একদিন আবুজেহেল কুরায়েশ সর্দারদের মজলিসে বলে যে, মুহাম্মদের উৎপাত তো বেড়েই চলেছে, সেইমত তারা আঁহযরত (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাদের সংঘবদ্ধভাবে বিরোধীতা শুরু করে দেয়। শুধু মৌখিক বিরোধীতাই নয় বরং শারিরীকভাবেও নিগ্রহ আরম্ভ করে। যারা কৃতদাস ছিল তাদের উপর তাদের মালিকদের তো অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে যায়। আর যারা স্বাধীন ছিল এবং জনপদে যাদেরকে সম্মানীয় মনে করা হত তাদেরও ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে যাতনা দেওয়া শুরু করা হল। আঁহযরত (সাঃ) তো তাদের বিরোধীতার প্রথম লক্ষ্য ছিলেন। খানা কাবাতে নামাজ পড়তেন যখন আবর্জনায় ভরা উটের নাড়ি-ভুঁড়ি আনিয়ে তাঁর পবিত্র পিঠের উপর রেখে হাঁসিঠাট্টা করা হত। কখনও আবার গলায় চাদর পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করেও হত্যার প্রয়াস করা হয়েছে। অনেক সময় আবার বিষ প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছে। রাস্তায় চলার সময় তাঁর উপর আবর্জনা নিক্ষেপ করা এবং কটুক্তির দ্বারা হৃদয় ভারাক্রান্ত করা নিত্ত নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল।

যাইহোক দীর্ঘ তেরো বছরের অবস্থান কালে মক্কার কাফেরদের বিরোধীতা, নির্যাতন এবং অত্যাচারের একটা সুদীর্ঘ অধ্যায় রয়েছে, যা এখানে তুলে ধরার অবকাশ নেই। কিন্তু এখানে এটা বলা আবশ্যক যে, যদিও তাঁর চাচা হযরত আবুতালেব তাঁর আনিত বার্তাকে অস্বীকার করেছিল

তথাপিও পবিত্রতা, তাঁর পুণ্যচেতা এবং দায়ীইলাল্লাহর উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ দেখে প্রভাবিত হয়েছিল। এই কারণে তার সমর্থন তিনি লাভ করেছিলেন। যেটা মক্কার কোরায়েশদের আঁহযরত (সাঃ) এর বিরুদ্ধে নির্মম পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে তাদেরকে বিরত রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা আঁহযরত (সাঃ) এর সমর্থন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কঠিন ভাষায় তাঁকে সাবধান করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেইমত কোরায়েশদের একটি দল আবুতালেবের নিকট উপস্থিত হয়ে বলে যে, "এখন বিষয়টা চরম সীমায় পৌঁছেছে এবং আমাদেরকে আবর্জনার ময়লা,মুর্খ এবং শয়তানের বংশধর বলা হচ্ছে। এবং আমাদের প্রতিমাগুলিকে জাহান্নামের ইন্ধন বলে বর্ণনা করা হচ্ছে এবং আমাদের বুজুর্গদেরকে বিবেকহীন বলে ডাকা হচ্ছে। এজন্য আমরা আর ধৈর্য ধারণ করতে পারব না। যদি আপনি তার সমর্থন থেকে বিরত না হন সেক্ষেত্রে আমরাও অসহায়.....।"

আবুতালেব আঁহযরত (সাঃ)কে ডেকে বলল হে আমার ভাতিজা এখন তোমার অভিশাপের কারণে জাতি এখন উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে। খুব শীঘ্রই এরা তোমাকে হত্যা করে ফেলবে আর আমাকেও । তুমি তাদের বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের বোকা বলেছ এবং তাদের বুজুর্গকে সারুল বারিয়া (সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট)

আখ্যায়িত করেছো এবং তাদের সম্মানীয় প্রতিমাদের নাম জাহান্নামের ইন্ধন রেখেছ। এবং সাধারণ ভাবে তুমি তাদের সকলকে নাপাক শয়তানের বংশধর এবং অপবিত্র সাব্যস্ত করেছ। আমি তোমার শুভাকাঙ্খী হয়ে বলছি নিজের ভাষার উপর সংযত হও এবং অভিশাপ দেওয়া থেকে বিরত থাক। নয়তো পুরো জাতির মোকাবেলা করার মত ক্ষমতা নেই। উত্তরে আঁহযরত (সাঃ) বললেন হে চাচা এটা অভিশাপ দেওয়া নয় বরং বাস্তব, ন্যায় সংগত এবং উপযুক্ত কথা। এর জন্যই তো আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। এর জন্য যদি আমাকে মরতে হয় তবে আমি আন্তরিকতার সাথে সেই মৃত্যুকে বরণ করছি। আমার জীবন এই পথে উৎসর্গীকৃত। মৃত্যুভয়ে আমি সত্যকে প্রকাশিত করা থেকে বিরত থাকতে পারিনা এবং হে আমার চাচা যদি তুমি নিজের দুর্বলতা ও কষ্টের চিন্তা কর তবে আমাকে নিজের ছত্রছায়া থেকে বিরত করে দাও। খোদার কসম তোমার কোন প্রয়োজন নেই আমার। আমার প্রভুর নির্দেশাবলী আমার কাছে নিজ প্রাণ অপেক্ষা বেশি প্রিয়। আমি ঐশী নির্দেশনার প্রচার থেকে কখনো বিরত হব না। খোদার শপথ যদি আমি এই পথে মৃত্যুবরণ ও করি তবে চাইব যে, বার বার জীবন লাভ করে সব সময় যেন এই পথেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি। এটা ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার জায়গা নয় বরং এই পথে কষ্ট স্বীকার করে আমি অফুরনীয় আনন্দ পাই।

আঁহযরত (সাঃ) এই বক্তব্য পরিবেশন করছিলেন যখন তাঁর মুখমন্ডল সত্য এবং জ্যোতির বিকিরণে উদ্ভাসিত হচ্ছিল এবং যখন তিনি এই বক্তব্য সমাপ্ত করলেন সত্যের এই জ্যোতিকে প্রত্যক্ষ করে আবুতালিবের অশ্রু জারি হয়ে গেল এবং বলল যে, "আমি তোমার এই উচ্চ অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলাম। তুমি ভিন্ন ধর্মী এবং ভিন্ন মর্যাদায় বিরাজিত। যাও নিজের কাজ শুরু কর। আজীবন আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি তোমার সাথে থাকব।"

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) নিজ পুস্তক **'ইযালায়ে আওহাম'** এর ১ম খণ্ডের পৃষ্ঠা স্বর ১০ এবং ১১ তে এই ঘটনা এবং উদ্ধৃতি তুলে ধরে টীকাতে লেখেন যে, আবুতালেবের এই ঘটনার বিষয়টি যদিও পুস্তক গুলির মধ্যে সংরক্ষিত তথাপিও সম্পূর্ণ ইলহামী বাক্য এটি যা খোদাতা'লা এই অধমের হৃদয়ে নাযিল করেছেন। শুধু কোন কোন শব্দের ব্যাখ্যার জন্য এই অধমের পক্ষ থেকে সংযুক্ত করা হয়েছে।

"سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ
سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ

যাইহোক কুরায়েশ সর্দারদের এই প্রচেষ্টাও যখন ব্যর্থ হয় তখন আঁহযরত (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাগণ সে স্বাধীন হোক কিম্বা কৃতদাস, মক্কার কাফেরদের অধিক নিশানায় পরিণত হয়। এমনকি কিছু সাহাবার করুণ পরিস্থিতিকে লক্ষ্য করে তিনি তাদেরকে হাবসার দিকে হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু স্বয়ং তিনি তাদের অত্যাচারের লক্ষ্যে পরিণত হতে থাকলেন। এমনকি যখন এই অত্যাচারীরা লক্ষ্য করল যে, হযরত হামযা এবং হযরত উমরের মত প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও মুসলমান হয়ে চলেছে এবং এই ধারাবাহিকতা বাড়তেই থাকছে তখন কুরায়েশ সর্দাররা সম্মিলিত পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত করল যে, এখন আঁহযরত (সাঃ) এবং বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের সকল সদস্যের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করবে । এভাবে সম্পূর্ণ বয়কটের অংঙ্গীকারনামা তৈরি করে সমস্ত বড় বড় প্রভাবশালী নেতাদের এতে সই করিয়ে কাবা ঘরের দেওয়ালে সেটি লাগিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলশ্রুতিতে কোরেশদের দুটো বড় বড় গোষ্ঠী বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব শোয়েব এ আবুতালেব নামে একটি উপত্যকায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তিন বছর সেখানে সামাজিক বয়কটের যন্ত্রনা ভোগ করে। শেষ পর্যন্ত ১০ই নববীতে আঁহযরত (সাঃ) এর একটি স্বপ্ন অনুযায়ী যখন তারা দেখল এই অঙ্গীকারনামায় আল্লাহর নামটি ব্যতিরেকে বাকী অক্ষর গুলো সব উইপোকায় নষ্ট করে দিয়েছে, তখন কিছু বিশিষ্ট জনেদের পরামর্শ অনুযায়ী এই অবরোধ থেকে তারা বিরত হয়।

(আসসীরাতুল নবুইয়্যাতুল ইবনে হিসসাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৫০,)

দীর্ঘ তিন বছরের এই অবরোধ ও দুঃখ দুর্দশা অতিক্রম করে নবুওয়তের ১১ তম বৎসরে আঁহযরত (সাঃ) এর চাচা আবুতালেব এবং তারও কিছুদিন পর তাঁর স্ত্রী হযরত খাদিজা (রাঃ) একে একে পরলোকে যাত্রা করেন। আবুতালেবের মৃত্যুর পর আঁহযরত (সাঃ) এর কষ্ট আরোও বেড়ে যায়। কিন্তু তাঁর এই কষ্টের এবং সমস্যাবলীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ ছিল না। কোন কিছুর জন্য যদি দুশ্চিন্তা করতেন তবে তা ছিল একমাত্র দাওয়াতে ইলাল্লাহর জন্য এবং সেই দিন তাঁর জন্য খুবই দুর্বিষহ হয়ে উঠত যেদিন তাঁর কথা শোনার মত কাউকে পেতেন না। তাই ঐশী বার্তা শোনানোর জন্য তিনি এই পদ্ধতি অবলম্বন করলেন যে, মক্কার নিকটবর্তী অঞ্চল আক্কায, যুলমাযায আর মাজনা নামক স্থানে যে মেলা বসত তিনি এই সমস্ত মেলায় উপস্থিত হতেন এবং সামনে যাকে পেতেন তাকে আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দিতেন।

রাবিয়া বিন ইবাদ বর্ণনা করেন যে, আমি রসূলুল্লাহকে যুলমাযায এর মেলায় দেখেছি, তিনি জনগণকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করছিলেন। তিনি বলতেন যে, তোমরা সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নাই তবেই মুক্তি লাভ করবে। আল্লাহতা'লা তোমাদের এ আদেশ দেয় যে তোমরা যেন একমাত্র তারই উপাসনা কর এবং তার সঙ্গে কাউকে শরীক না কর। এবং আমি তোমাদের দিকে প্রেরিত আল্লাহতা'লার এক রসূল মাত্র। তিনি যখন জনগণকে আল্লাহত'লার পয়গাম পৌঁছে দিতে সচেষ্ট থাকতেন তার পিছনে আবুলাহাব ও আবুজেহেল চেঁচাতেন এবং ধূলো উড়িয়ে দিত এবং লোকেদের পথ ভ্রষ্ট করে বলত যে, এ মিথ্যাবাদী এ কথা কখনো শুনবে না। এমনটা না হয় যেন এই ব্যক্তি তোমাদের ধর্ম থেকে তোমাদের বিচ্যুত করে।

শ্রোতামণ্ডলী!

আঁহযরত (সাঃ) এর দাওয়াতে ইলাল্লাহর বর্ণনায় তায়েফ সফরের ঘটনা তো বিস্মৃত হওয়ার নয়। মক্কা থেকে চল্লিশ মাইল দূরে তায়েফ বস্তিতে তার একটি মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম যায়েদ এর সঙ্গে উপস্থিত হন। সেখানে অন্যান্য অভিজাত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে শাকিফ গোষ্ঠীর তিনজন সর্দারও উপস্থিত ছিলেন যাদের সঙ্গে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মাতুলালয়ের দিক থেকে আত্মীয়তা ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানান এবং মক্কার কোরায়েশদের বিরোধীতার কথা উল্লেখ করে তাদের সাহায্য কামনা করেন। এটা শুনে তাদের মধ্যে একজন সর্দার বলল যদি তোমাকে খোদার রসূল বানিয়ে প্রেরণ করে তবে সে কাবার সম্মানহানী করছে। দ্বিতীয়জন বলল তোমাকে ব্যতিরেকে আল্লাহর কি অন্য কোন রসূল ছিল না যাকে সে প্রেরণ করতে পারত? অপর জন বলে উঠল খোদার কসম আমি তোমার সঙ্গে কথা বলার ও ইচ্ছা প্রকাশ করছি না।.....

(ইবনে হিসসাম ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪১৯)

এবং বলল যে, এখনই এই বস্তি থেকে বেরিয়ে যাও। শুধু এতটুকু বলে শান্ত হল না বরং কিছু গোলাম এবং বখাটে যুবককে তাঁর পিছনে লাগিয়ে দেওয়া হল যারা তাঁকে গালি দিতে এবং ঝগড়া করতে লাগল। এতক্ষণে এত বড় একটা জনসমাগম একত্রিত হয়ে রাস্তার দুইপাশে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। হযরত যায়েদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সম্মুখে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে পাথর থেকে তাঁকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করল কিন্তু একাকী তার দ্বারা কিভাবে সম্ভব হত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর গোড়ালি ক্ষতবিক্ষত এবং জুতো রক্তে ভরে গেল এবং হযরত যায়েদও খুবই আহত হল। আর এই ভীড় তখনই ফেরত আসল যতক্ষণ না তারা মক্কার দুজন সর্দার উৎবা আর সায়বার আঙুর বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

মোটকথা তায়েফের এই দিনটি আমাদের নেতা ও প্রভু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর খুবই বেদনাদায়ক দিন ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) একবার নবী করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, উহুদের দিন অপেক্ষাও কি কোন কঠিন দিন আপনার উপর এসেছিল? (উহুদের যুদ্ধে তাঁর দাঁত শহীদ হয়েছিল এবং মুখমণ্ডল আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল) উত্তরে তিনি বললেন, আয়েশা তোমার জাতির কাছ থেকে খুবই কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু সবচেয়ে বেশি কষ্ট সেটা যা আমি তায়েফ শহরে পেয়েছিলাম। সেই সময় আমি খুবই দুঃখিত হয়ে মাথা নিচু করে চলাফেরা করতাম। দেখলাম যে, একটি মেঘ আমাকে ছায়া করে

রেখেছে। তখন পাহাড়ের ফেরেস্তা আমাকে আওয়াজ দিল এবং সালাম করে বলল যে, আমি পাহাড়ের ফেরেস্তা, আপনার প্রভু আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন, যাতে আপনার নির্দেশ মত কাজ করতে পারি। হে মুহাম্মদ সাঃ) আাপনি কি চান এই উপত্যকার পাহাড় দুটি এদের উপর চাপিয়ে দিই? দয়াল নবী বললেন! না না এমনটা করোনা। আশা করি এই জাতির মধ্যে আল্লাহতা'লা এমন লোককে সৃষ্টি করবেন যারা এক আল্লাহর ইবাদতকারী হবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবে না।

(বুখারী বাদাউল খাল্‌ক অধ্যায় ৭)

শ্রোতা মণ্ডলী!

আঁহযরত (সাঃ) এর হৃদয়ে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার যে উদ্দীপনা এবং মক্কার কাফেরদের ঈমান না আনার যে আফসোস ও দুঃখ ছিল সেই অবস্থা একমাত্র আলিমুল গায়েব আল্লাহতা'লা ব্যতিরেকে কেউ জানতেন না। তাই আল্লাহতা'লা তাঁর হৃদয়ের এই অবস্থাকে এভাবে চিত্রায়িত করেছেন-

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

(সূরা শো'আরা:৪)

হে মুহাম্মদ! তারা মু'মিন হচ্ছেনা বলে তুমি কি নিজ প্রাণ বিনাশ করে ফেলবে?

আঁহযরত (সাঃ) এর তায়েফ সফরে দাওয়াতে ইলাল্লাহর পথে কষ্টের সহনশীলতা এবং অত্যাচারিদের বংশধরদের ভিতর থেকে ঈমান নিয়ে আসায় তাদের প্রতি করা মার্জনার ফল বারো বছর পর প্রকাশ পায়। নবম হিজরীতে যখন তিনি তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন তখন তায়েফের একটি সর্দার প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁর নিকট আসেন এবং তায়েফবাসীর পক্ষ থেকে ইসলাম গ্রহণ করেন।

যাইহোক فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা তুমি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর (সূরা আল হিজর : ৯৫) এর নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর মক্কী জীবনের এক একটা দিন আঁহযরত (সাঃ) এর দাওয়াতে ইলাল্লাহর প্রচেষ্টায় ব্যায়িত হতে লাগল। কিন্তু মক্কার রুক্ষ ভূমিতে যেখানে গুটি কয়েক স্বাধীন এবং গোলাম সহচারী তিনি লাভ করলেন, সেখানে কোরায়েশ সর্দারেরা এই ঐশী পয়গামকে শুধু অস্বীকারই করল না বরং আঁহযরত (সাঃ) এবং নামমাত্র কয়েকজন সাহাবাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলল। শেষ পর্যন্ত যখন তারা এই উপলব্ধি করল যে, তিনি কোন মতে দাওয়াতে ইলাল্লহর কর্তব্য থেকে বিরত হওয়ার নয় তখন সমস্ত গোত্র একত্রিত হয়ে এই নির্ণয় করল যে, প্রতিটা গোত্র থেকে একজন একজন প্রতিনিধি একত্রিত হয়ে তাঁকে গৃহবন্দী করবে এবং বাইরে বের হওয়া মাত্রই হত্যা করবে। অপর দিকে আল্লাহতা'লা ইয়াসরাব ভুমিতে যা পরে মদীনা নামে বিখ্যাত হয়েছে, সেখানে প্রাণ নিবেদনকারী প্রেমিকের সারি দন্ডায়মান করে দেন। যা বয়াতে উকবা ও ১ম ও ২য় তে তিনি লাভ করেছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহতা'লা তাকে জরুরী ভিত্তিতে মক্কা থেকে মদীনা হিজরতের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি আল্লাহ তাআলার বিশেষ হিফাযত ও আশ্রয়ে তার এক বিশেষ সাথি হজরত আবুবকরের সঙ্গে ঘেরাও কারীদের চোখের সামনে মক্কা ভূমি থেকে নির্গত হন। এবং সুর গুহাতে তিনদিন আশ্রয় যাপনের পর মদীনা অভিমুখে হিজরত করেন। ধীরে ধীরে মক্কার প্রাণ নিবেদনকারী সাহাবারাও হিজরত করে মদীনাতে আসা শুরু করেন। এবং মহাজির ও আনসারদের একটি জামাত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরিশেষে দাওয়াতে ইলাল্লাহর একটি নতুন যুগের সূচনা হয়। ইহুদীদেরও তবলীগ করা হয়, নাসারাদেরও। সাধারণ নাগরিককেও তবলীগ করা হয় এবং প্রভাবশলীদেরও। এমনকি আঁহযরত (সাঃ) আশেপাশের বড় বড় রাষ্ট্রের বাদশাহগণ এবং রাষ্ট্রনেতাদেরকেও তবলীগি পত্র লিখে নিজের বিশেষ দূতদের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সেইমত ইরানের বাদশাহ কেশরা, রোমের বাদশাহ কায়সার, হাবসার বাদশাহ নাজ্জাসী, মিশরের বাদশাহ, গাসসান প্রদেশের বাদশাহ একই রকম ভাবে ইয়ামামা, আম্মান এবং বাহরীনের সুলতানগণের নিকটও তবলীগি পত্র প্রেরণ করা হয়। কয়েকজন সৌভাগ্যশালী বাদশাহ আঁহযরত (সাঃ) এর পত্রগুলি চোখে লাগায় এবং সম্মানের আতিশয্য প্রকাশ করেন। বিনিময়ে আল্লাহতা'লা ও তাদের উপর অনুগ্রহ করে। কয়েকজন বাদশাহ অসম্মান ও বিদ্রুপ প্রকাশ করে তাঁর পত্রগুলিকে ছিঁড়ে দেওয়ায় ফলশ্রুতিতে আল্লাহতা'লা তাদের রাজত্বকে টুকরো টুকরো করে দেয়।

আবার আল্লাহর নির্দেশে বদরের যুদ্ধের দ্বারা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের যে ধরাবাহিকতা শুরু হয় তন্মধ্যেও দাওয়াতে ইলাল্লাহর দিকটিও প্রতিটি আঙ্গীকে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। খায়বারের যুদ্ধে ইসলামের পতাকা আঁ হযরত (সাঃ) হযরত আলীকে সমর্পণ করে বলেন এখনই যাত্রা শুরু কর এবং তাদের ময়দানে গিয়ে উপস্থিত হও। তারপর তাদেরকে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানাও। এবং তাদের উপর আল্লাহতা'লার অধিকার সমূহ সম্পর্কে বল। তিনি (সাঃ) আরোও বলেন আল্লাহর কসম তোমার তবলীগের মাধ্যমে যদি আল্লাহতা'লা একজনকেও হেদায়েত দিয়ে দেন সেক্ষেত্রে এই সৌভাগ্য তোমার জন্য লাল উট অপেক্ষাও অধিক উত্তম সাব্যস্ত হবে।

শ্রোতামণ্ডলী! আজীবন দাওয়াতে ইলাল্লাহর কর্তব্য পালন করে শেষ হজ্জ যা বিদায় হজ্জ নামে খ্যাত সেখানে হাজার হাজার মুসলমানের উপস্থিতিতে ঘোষণা করেন "আল্লাহুম্মা হাল বাল্লাগতু" আল্লাহর খাতিরে সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি কি আল্লাহর পয়গামকে যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছি? সবাই এক বাক্যে বলল ইয়া রসূলুল্লাহ্ আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনি দাওয়াতে ইলাল্লহর কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেছেন। পুনরায় তিনি বললেন হে আল্লাহ তুমিও সাক্ষী রইলে।

(বুখারী কিতাবুল হজ্জ, অধ্যায়: ১৩১)

(সমস্ত উদ্ধৃতি হাফিজ মোজাফফর আহমদ প্রণিত পুস্তক 'উসওয়ায়ে ইনসানে কামিল' হতে সংগৃহিত)।

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন

"সুতরাং নবী (সাঃ) সত্য প্রকাশের লক্ষ্যে এক মহান সংস্কারক ছিলেন। তিনি অবলুপ্ত সত্যকে পুনরায় ধরাতে নিয়ে এসেছেন। .....আঁহযরত (সাঃ) এর নবুওয়তের সত্যতার পক্ষে এটি একটি বড় প্রমাণ যে, তিনি এমন এক সময়ে প্রেরিত ও আবির্ভূত হয়েছেন, যখন যুগ চরম পর্যায়ের অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল আর স্বভাবতই এক মহান সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। অতঃপর তিনি এমন একটি সময়ে ইন্তেকাল করেছেন যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ শিরক এবং মুর্তিপূজা পরিত্যাগ করে তৌহিদ (একত্ববাদ) ও সঠিক পথকে অবলম্বন করেছিল আর প্রকৃতপক্ষে এ কামেল ও পরিপূর্ণ সংশোধন তাঁরই বিশেষত্ব । তিনি একটি বন্য স্বভাবের ও পশু প্রকৃতির জাতিকে মানবীয় অভ্যাস শিখিয়েছেন। অথবা অন্য কথায় বলা যায়, পশুকে তিনি মানুষ বানিয়েছেন আর মানুষকে শিক্ষিত মানুষে পরিণত করেছেন। এবং শিক্ষিত মানুষকে খোদা প্রেমিক বানিয়েছেন এবং তাদের মাঝে আধ্যাত্মিকতার নিগূঢ় মন্ত্র ফুৎকার করেছেন এবং সত্য খোদার সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন। তাদেরকে খোদার পথে ছাগলের মত জবাই করা হয়েছে। তারা পিপীলিকার মত পদতলে পিষ্ট হয়েছেন, কিন্তু ঈমানকে নষ্ট হতে দেননি বরং সব বিপদের সময় সামনে অগ্রসর হয়েছেন। তাই নিঃসেন্দহে আমাদের নবী (সাঃ) আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠার নিরীখে দ্বিতীয় আদম ছিলেন। বরং সত্যিকারের আদম তিনিই ছিলেন যাঁর মাধ্যমে এবং যাঁর কল্যাণে মানবীয় গুণাবলী উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং পুণ্য শক্তিসমূহ স্ব স্ব কাজে নিয়োজিত হয়েছে। মানব প্রকৃতির কোন শাখা ফুল-ফল শূন্য থাকে নি। নবুওয়ত তাঁর সত্ত্বাতে শুধু যুগের পরিসমাপ্তির কারণে শেষ হয় নি, বরং নবুওয়তের পরাকাষ্ঠা তাঁর ভিতর পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

(লেকচার সিয়ালকোট, রুহানী খাযায়েন, পৃষ্ঠা : ২০৬-২০৭)

শ্রোতামণ্ডলী! আঁহযরত (সাঃ)কে শুধুমাত্র আরব দেশের জন্য রসূল করে প্রেরণ করা হয়নি বরং সমস্ত মানব জাতিই তাঁর তত্বাবধানে ছিল। তাই আল্লাহতা'লা কোরআন করীমে তাঁর মাধ্যমে এই ঘোষণা দেন যে,

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

(সূরা আল আরাফ :১৫৯)

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সাঃ) তুমি বল, হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার জন্য আকাশ সমূহের ও পৃথিবীর রাজত্বের অধিকারী আল্লাহর রসূল।

আবার সূরা আহযাবের যে আয়াত আমি শুরুতে তেলাওয়াত করেছি সেখানে তাকে সীরাজে মুনীর বা দেদীপ্যমান্য সূর্য উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। এতে এই বার্তা নিহিত ছিল যে, আঁহযরত (সাঃ) এর পুন্যময় জীবনে সমস্ত মানব জাতি অবধি ইসলামের বার্তা পৌঁছে

দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই আধ্যাত্মিক সূর্য অস্তমিত হওয়া সত্ত্বেও এর জ্যোতি কখনো নিস্প্রভ হতে পারত না, কেননা চাঁদ উদিত হয়ে এই আধ্যাত্মিক সূর্যের বিকিরণের মাধ্যমে পৃথিবীকে আলোকিত করতে হত এবং পূর্ণ চন্দ্রের মাধ্যমে অর্থাৎ তাঁর রুহানী সন্তান মসীহে মাওউদের মাধ্যমে ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের ঐশী পরিকল্পনা বাস্তব রূপ নিতে পারত যার প্রতিশ্রুতি "ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল হাকুবিহিম" এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

হজরত মসীহ মাউদ (আ:) নিজ পুস্তকাবলীতে খুবই প্রাঞ্জল্যভাবে এই বিষয়টি বর্ণনা করেছেন যে,আঁ হজরত (সা:) এর প্রথম যুগে হেদায়েতের পরিপূর্ণতা খুবই স্বার্থক ভাবে সুসম্পন্ন হয়েছিল। এখন তাঁর দ্বিতীয় আগমন যা তাঁর রুহানী সন্তান মসীহ মাউদ রূপে নির্ধারিত ছিল তা এশায়তের পরিপূর্ণতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । যে জন্য আল্লাহ তা'লা হজরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি (আঃ) কে আঁ হজরত (সঃ)- র পূর্ণ প্রতিচ্ছবি রূপে মসীহ আর মাহদীর মর্যাদায় ভূষিত করে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেছেন। আর আজকের উন্নতিশীল দেশগুলির প্রয়োজনীয় গণমাধ্যম গুলি তাদের প্রদান করেছেন। এখন প্রয়োজন এটাই যে জামাতের সমস্ত সদস্যরা এই উন্নত গণমাধ্যমগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে দাওয়াত ইলাল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকে যেন যথাযথ ভাবে পালন করে। আমাদের প্রিয় হুজুর পুনরায় ৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রদত্ত খোতবায় জামাতের সদস্যদেরকে দাওয়াতে ইলাল্লাহর দিকে দৃষ্ট আকর্ষণ করে বলেন যে,

তাই আমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে তবলীগ করে যেতে হবে। এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, বছরে একবার বা দু'বার 'তবলীগি আশারা' উদ্‌যাপন করলাম, রাস্তায় দাঁড়িয়ে বইপুস্তক বিতরণ করলাম আর ধরে নিলাম যে, তবলীগের দায়িত্ব পালন হয়ে গেছে............অতএব, আল্লাহ্ তা'লা প্রজ্ঞা এবং সুন্দর নসীহত এবং বস্ত নিষ্ঠ যুক্তির ভিত্তিতে তবলীগের যে নির্দেশ দিয়েছেন সে অনুসারে কাজ করা আমাদের জন্য আবশ্যক। আর অবিচলতার সাথে তবলীগ অব্যাহত রাখা আমাদের দায়িত্ব। এর ফলাফল সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন আমি নিজেই প্রকাশ করব। কে ভ্রষ্টতায় হাবুডুবু খাবে আর কে সঠিক পথ পাবে এই বিষয়গুলো আল্লাহ তা'লাই ভাল জানেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যা জিজ্ঞেস করবেন কেবল এতটুকুই যে, আমরা পয়গাম পৌছিয়েছি কি না বা আমরা তবলীগ করেছি কি না বা আমরা কেন তবলীগের দায়িত্ব পালন করি নি, কেন খোদার নির্দেশ অনুসা রে তবলীগ করি নি। কে হেদায়াত পাবে আর কে পাবে না বা কে সত্য গ্রহণ করবে আর কে করবে না, তা আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন। যদি আমরা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে থাকি তাহলে এ পৃথিবীর মানুষ অন্ততপক্ষে মৃত্যুর পর এ কথা বলতে পারবে না যে, আমরা তো ইসলামের সংবাদই পাই নি।"

খোতবার শেষে হুজুর আনোয়ার (আইঃ) হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) এর একটি উদ্ধৃতি পড়ে শোনান, যেখানে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন :-

"ইসলামের সুরক্ষা, হেফাজত আর এর সত্যতা প্রকাশ করার জন্য সর্ব প্রথম যে দিকটা সামনে থাকতে হবে তাহল প্রকৃত মুসলমানের দৃষ্টান্ত হও আর দ্বিতীয় দিক হল এর সৌন্দর্য এর শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীতে প্রচার কর। প্রথমে উত্তম আদর্শ হও এরপর ইসলামের তবলীগ কর এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার কর।"

(মালফুযাত ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩২৩)

এরপর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, "সুতরাং ইসলামের তবলীগ করার জন্য প্রথমে নিজেদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন আনতে হবে। এক সত্যিকার মানুষ যদি প্রকৃত অর্থে মুসলমান হ য়ে যায় তাহলে মানুষের মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ না হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। মানুষ দৃষ্টান্ত দেখেই কোন কিছুর প্রতি মনোযোগী হয়। কোন কিছু বলার পূর্বেই তবলীগের পথ সুগম হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই অনুসারে চলার তৌফিক দান করুন।"

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اَطِعْ اَبَاكَ

(নিজ পিতার আনুগত্য কর)

পিতার আনুগত্য করা সন্তানের জন্য কেবল সৌভাগ্যের কারণই নয় বরং পিতা সন্তানের প্রকৃত হিতাকাঙ্খী ও অভিজ্ঞ হওয়ার কারণে তাঁর আনুগত্য করা মঙ্গলজনক। (হাদীস)

سرے دارم فدائے خاکِ احمدؐ
دلم ہر وقت قربانِ محمدؐ ﷺ

کلام سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام

عجب نوریست در جانِ محمدؐ — عجب لعلیست در کانِ محمدؐ
ز ظلمتہا دلے آنگہ شود صاف — کہ گردد از محبانِ محمدؐ
عجب دارم دلِ آں ناکساں را — کہ رُو تابند از خوانِ محمدؐ
ندانم ہیچ نفسے در دو عالم — کہ دارد شوکت و شانِ محمدؐ
خدا زاں سینہ بیزار است صد بار — کہ ہست از کینہ دارانِ محمدؐ
خدا خود سوزد آں کرمِ دنی را — کہ باشد از عدوانِ محمدؐ
اگر خواہی نجات از مستیِ نفس — بیا در ذیلِ مستانِ محمدؐ
اگر خواہی کہ حق گوید ثنایت — بشو از دل ثنا خوانِ محمدؐ
اگر خواہی دلیلے عاشقش باش — محمدؐ ہست برہانِ محمدؐ
سرے دارم فدائے خاکِ احمدؐ — دلم ہر وقت قربانِ محمدؐ
بگیسوئے رسول اللہ کہ ہستم — نثارِ روئے تابانِ محمدؐ
دریں رہ گر کشندم ور بسوزند — نتابم رو ز ایوانِ محمدؐ
بکارِ دیں نترسم از جہانے — کہ دارم رنگِ ایمانِ محمدؐ
بسے سہل است از دنیا بریدن — بیادِ حسن و احسانِ محمدؐ
فدا شد در رہش ہر ذرۂ من — کہ دیدم حسنِ پنہانِ محمدؐ
دگر اُستاد را نامے ندانم — کہ خواندم در دبستانِ محمدؐ
بدیگر دلبرے کارے ندارم — کہ ہستم کشتۂ آنِ محمدؐ
مرا آں گوشۂ چشمے بباید — نخواہم جز گلستانِ محمدؐ
دلِ زارم بہ پہلویم مجوئید — کہ بستیمش بدامانِ محمدؐ
من آں خوش مرغ از مرغانِ قدسم — کہ دارد جا بہ بستانِ محمدؐ
تو جانِ ما منور کردی از عشق — فدایت جانم اے جانِ محمدؐ
دریغا گر دہم صد جاں دریں راہ — نباشد نیز شایانِ محمدؐ
چہ ہیبت ہا بدادند ایں جواں را — کہ ناید کس بہ میدانِ محمدؐ
الا اے دشمنِ نادان و بے راہ — بترس از تیغِ بُرّانِ محمدؐ
رہِ مولیٰ کہ گم کردند مردم — بجو در آل و اعوانِ محمدؐ
الا اے منکر از شانِ محمدؐ — ہم از نورِ نمایانِ محمدؐ
کرامت گرچہ بے نام و نشاں است — بیا بنگر ز غلمانِ محمدؐ

এরপর ২৩এর পাতায়

বেষ্টনীতে স্থান দিন এবং শত্রুর সকল প্রকারের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হোক।

জলসার পর জলসায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত অতিথিরা যারা এখন কাদিয়ানে আছেন, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা নির্বিঘ্নে বাড়ি পৌঁছে দিন এবং জলসার দিনগুলির আশিস ও কল্যাণরাজিকে চিরকাল নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করুন।

এরপর আমরা দোয়া করব। কিন্তু দোয়ার পূর্বে আমি সেখানকার উপস্থিতির রিপোর্ট পেশ করব। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে, এই সময় কাদিয়ানের জলসায় ৪৪ টি দেশের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে আর কুড়ি হাজার আটচল্লিশ জন অতিথি অংশ গ্রহণ করেছেন যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ছয় হাজার বেশি। আর এখানকার উপস্থিতির সংখ্যা পাঁচ হাজার তিন শ'। আল্লাহ্ তা'লা অংশগ্রহণকারীদের উপর হাফেয ও নাসের হন। এখন দোয়া করে নিন।

اِجْتَنِبُوْا كُلَّ مُسْكِرٍ -

-হাদীস

18 এর পাতার পর

এর উপরে তাদের ঈমান এমনভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল যে, রসূলে করীম (সা.) যখন যমযমের পানি চাইলেন (যমযম সেই প্রস্রবণ যা সৃষ্টি করেছিলেন আল্লাহতা'লা ইসমাঈল বিন ইব্রাহীম [আ.]-এর জন্য নিদর্শন স্বরূপ) এবং সেই পানি থেকে কিছুটা পান করে বাকী পানি দিয়ে ওযু করলেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডল ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে এক ফোঁটা পানিও মাটিতে পড়তে পারেনি। মুসলমানরা তাবারকস্বরূপ সেই পানি হাত থেকে মুছে নিয়ে নিজেদের চোখেমুখে ও শরীরে লাগাচ্ছিল। তখন মুশরেকরা বলাবলি করছিল যে, আমরা পৃথিবীতে এমন কোন বাদশাহ্ দেখিনি যাঁর প্রতি তার লোকেরা এত বেশী ভালবাসা রাখে।

(সীরাতুল হুলবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০১, ১৯৩৫ সালে মিশরে প্রকাশিত সংস্করণ)

যখন তিনি ঐসব কাজ থেকে অবসর হলেন এবং মক্কাবাসীদেরকে তাঁর সামনে হাজির করা হলো, তখন তিনি বললেন, 'হে মক্কাবাসীরা! তোমরা দেখছ যে,খোদাতা'লার নিদর্শনসমূহ কীভাবে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। এখন তোমরা বলো তোমাদের সেই সব অত্যাচার ও দুষ্কর্মের কি প্রতিশোধ তোমাদেরকে দেওয়া দরকার, যা তোমরা করেছিলে এক-আল্লাহর এবাদাতকারী তাঁর গরীব বান্দাদের প্রতি ?'

মক্কাবাসীরা বললো, আমরা আপনার কাছে সেই ব্যবহারই আশা করি যা ইউসুফ করেছিলেন তাঁর ভাইদের প্রতি।'

এ খোদাতা'লারই এক কুদরত ছিল যে, মক্কাবসীদের মুখ থেকে সেকথাই বেরিয়ে এলো যার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আল্লাহতা'লা সূরা ইউসুফে। বহু পূর্বেই আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে (সা.) মক্কা বিজয়ের দশ বছর পূর্বে বলে ছিলেন যে, তুমি মক্কাবাসীদের সঙ্গে ঠিক তেমন ব্যবহার করবে যেমন করেছিল ইউসুফ তার ভাইদের সঙ্গে। সুতরাং যখন মক্কাবাসীদের মুখ দিয়ে তার সত্যায়ন বা তসদীক করা হলো (রসূলে করীম -সা.-ছিলেন ইউসুফ -আ.-এর এক মসীল বা সদৃশ) এবং যখন আল্লাহতা'লা ইউসুফের মতই তাঁকে তাঁর ভাইদের উরে বিজয় দান করলেন. তখন তিনি (আ.) ঘোষণা করলেন

تَاللّٰهِ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ

'আল্লাহর কসম! আজ তোমাদেরকে না কোন শাস্তি দান করা হবে, না তোমাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে।'

(সীরাতুল হুলবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৯, ১৯৩৫ সালে মিশরে প্রকাশিত সংস্করণ)

রসূলে করীম (সা.) যখন কাবাতে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক এবাদতে মশগুল ছিলেন এবং যখন তিনি তঁর স্বজাতির প্রতি ক্ষমার বাণী প্রচার করছিলেন, দয়া প্রদর্শন করচিলেন, তখন আনসারদের মন ছোট হয়ে যাচ্ছিল, তাদের মনে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হচ্ছিল এবং তাঁরা একে অপরকে ইশারা ইঙ্গিতে বলছিলেন যে, হয়তো আজ আমরা আমাদের রসূলকে আজমাদের কাছ থেকে পৃথক করে দিতে যাচ্ছি। কেননা, তাঁর শহরের বিজয় খোদাতা'লা তাঁর হাতেই সম্পন্ন করেছেন এবং তাঁর স্বগোত্র তাঁর উপরে ঈমান এনেছে। ঠিক সেই সময় আল্লাহতা'লা ওহীর মাধ্যমে মুহাম্মাদুর রসূল্লাহ (সা.)-কে আনসারদের মনের এই সন্দেহ সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি তখন মাথা তুলে আনসারদের প্রতি তাকালেন এবং বললেন,

'হে আনসারগণ! তোমরা মনে করছ যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ এই শহরের ভালবাসায় অভিভূত হয়ে পড়েছেন এবং তাঁর স্বজাতির প্রেম তাঁর হৃদয়কে আপ্লুত করে ফেলেছে।'

আনসাররা বলরেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ্! হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন, আমাদের মনে এইরূপ ধারণাই সৃষ্টি হয়েছে।'

আঁ হযরত (সা.) বললেন. 'তোমরা কি জান না, আমি কে ? আমি তো আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। তাহলে এটা কি করে হতে পারে যে, তোমরা যারা ইসলামের অসহায় অবস্থার সময়ে নিজেদের জীবনের কোরবানী দিয়েছ, তাদেরকে ছেড়ে আমি অন্য কোথাও চলে যাব?'

তিনি আরও বললেন, 'হে আনসাররা! এটা কখনই হতে পারে না। আমি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রসূল। আমি আল্লাহর জন্যই নিজের মাতৃ ভূমি ছেড়ে চলে গেছি। অতঃপর, আমি কোন মতে আমার মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে পারি না। আমার জীবন তোমাদের জীবনের সঙ্গে এবং আমার মৃত্যু তোমাদের মৃত্যুর সঙ্গে গাঁথা রয়েছে।'

মদীনাবাসীরা আঁ হযরত (সা.)-এর এই কথা শুনে এবং তাঁর ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা দেখে তারা কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে এলো এবং বললো, 'ইয়া রসূলুল্লাহ্! আল্লাহর কসম! আমরা আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রসূলের বিষয়ে কুধারণা পোষণ করে ফেলেছি কেননা, আমাদের প্রাণ এটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিল না যে,আল্লাহর রসূল আমাদের শহরকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান।'

আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলতোমাদেরকে নির্দোষ মনে করছেন এবং তোমাদের আন্তরিকতার সত্যায়ন করছেন।'

যখন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং মদীনার লোকদের মধ্যে ভালবাসাপূর্ণ এইসব কথাবার্তা হচ্ছিল, তখন মক্কাবাসীদের চোখ থেকে হয়তো দৃশ্যতঃ অশ্রু ঝরল না, কিন্তু তাদের হৃদয়ের অশ্রু অবশ্যই ঝরছিল। কেননা, যে মহামূল্য হীরা, যার চাইতে অধিক মূল্যবান পৃথিবীতে আর কিছু তৈরী হয়নি, যা খোদা তাদেরকে দিয়েছিলেন, তা তারা নিজেরা নিজেদের ঘর থেকে বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এবং খোদাতা'লার কৃপায় এবং তাঁর সাহায্যে দ্বিতীয়বার মক্কায় এসেছিল, কিন্তু তার নিজের কৃতজ্ঞতা অঙ্গীকারের কারণে নিজের ইচ্ছায় এবং খুশীতে মক্কা ছেড়ে মদীনায় ফিরে যাচ্ছে।

যে কয়জন লোক সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা.) রায় * দিয়েছিলেন যে,, তাদের অত্যাচারমূলক হত্যাকাণ্ড এবং নানাবিধ জুলুম ও নির্যাতনের অপরাধের দরুন তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে, তাদেরও অনেককেই তিনি কোন কোন মুসলমানদের সুপারিশের কারণে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। ক্ষমাপ্রাপ্তদের মধ্যে একজন ছিল আবু জাহলের পুত্র একরামা। একরামার স্ত্রী মনে মনে মুসলমান হয়েছিল। সে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আবেদন করল, 'ইয়া রসূলুল্লাহ্! একরামাকেও কি আপনি ক্ষমা করে দিয়েছেন ? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, 'হ্যাঁ, আমি ওকে মাফ করে দিয়েছি।'

একরামা তখন ইয়েমেনের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল। তার স্ত্রী তার প্রতি ভালবাসার দরুন তার পিছনে পিছনে তাঁর খোঁজে বের হয়ে গেল। যখন সে সমুদ্রগামী জাহাজে উঠে পড়েছে এবং আরবকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলেছে, তখন পলাতক সেই সর্দারের স্ত্রী পেরেশান হয়ে তার নিকটে পৌঁছল এবং বললো, 'হে আমার চাচার পুত্র! (আরব স্ত্রীলোকেরা তাদের স্বামীদেরকে চাচার পুত্র বলে সম্বোধন করতো)। তুমি অত ভাল এবং অত দয়ালু মানুষটিকে ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ।' একরামা বিস্মিত হয়ে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো, 'বলো কি ? আমার এতসব শত্রুতার পরেও কি মুহাম্মদ (সা.) আমাকে ক্ষমা করে দিবেন ?' একরামার স্ত্রী বললো, 'হ্যাঁ, আমি তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছি এবং তিনি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।' সে যখন ফিরে এসে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, 'ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমার স্ত্রী বলছে যে, আপনি নাকি আমার মত একটা লোককেও ক্ষমা করে দিয়েছেন ?' আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'তোমার স্ত্রী ঠিকই বলেছে। আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি।' একরামা বলে উঠলো, 'যে ব্যক্তি এমন ঘোরশত্রুকে মাফ করতে পারে, সে কখনও মিথ্যা হতে পারে না।' আমি সাক্ষ্যদান করছি যে, আল্লাহ্ এক তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্যদান করছি, হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি তাঁর বান্দা এবং রসূল।'

অতঃপর, সে লজ্জায় এত বেশী মাথা নীচু করে ফেললো যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার এই লজ্জিত অবস্থা দেখে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললেন, 'একরামা আমি শুধু তোমাকে ক্ষমাই করছি না, তুমি আজ আমার কাছে যা চাইবে, আমি তাই তোমাকে দিব, যদি তা দেওয়ার ক্ষমতা আমার থাকে।'

একরামা বললেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ্! ইয়া রসূলুল্লাহ্! এর বেশী আমি কি চাইতে পারি। আপনি আল্লাহতা'লার কাছে দোয়া করুন, আমি যে শত্রুতা করেছি আপনার সাথে, তা যেন আল্লাহ মাফ করে দেন। রসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহতা'লাকে সম্বোধন করে বললেন,

'হে আমার আল্লাহ! সেই সমস্ত শত্রুতা যা একরামা আমার বিরুদ্ধে করেছে, তা তুমি মাফ করে দাও এবং যে সমস্ত গালিগালাজ তার মুখ

তেকে বের হয়েছিল, তার জন্যেও তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।'

এরপর, রসূলুল্লাহ (সা.) উঠলেন এবং তাঁর নিজের গায়ের চাদর নিয়ে একরামার গায়ে জড়িয়ে দিলেন এবং বললেন,

'যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর উপরি ঈমান এনে আমার কাছে চায় তখন আমার ঘর তার ঘর হয়ে যায় এবং আমার জায়গা তার জায়গা হয়ে যায়।'

(সীরাতুল হুলবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০৬, ১৯৩৫ সালে মিশরে প্রকাশিত সংস্করণ)

একরামার ঈমান আনার মাধ্যমে সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হলো যার বিবরণ দিয়েছিলেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীদের কাছে। তিনি বলেছিলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি বেহেশ্‌তে আছি এবং সেকানে আঙ্গুরের একটা থোকা দেখলাম এবং লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার জন্য ? তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, 'আবু জাহলের জন্য'। তার কথা আমাকে অবাক করলো আমি বললাম, বেহেশতে তো মুমিন ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারে না। বেহেশ্‌তের মধ্যে আবু জাহলের জন্য আঙ্গুর দেওয়া হলো কি করে?'

একরামা ঈমান আনলে পর, তিনি ঐ স্বপ্নে ব্যাখ্যায় বললেন, 'আসলে, ঐ আঙ্গুর গুচ্ছ ছিল একরামার জন্যে। খোদাতা'লা ছেলের জায়গায় বাপের নাম প্রকাশ করেছিলেন এবং স্বপ্নে অনেক সময় ঘটনাকে এভাবেও প্রকাশ করা হয়।

(সীরাতুল হুলবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০৬, ১৯৩৫ সালে মিশরে প্রকাশিত সংস্করণ)

যে কয়জন লোকের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছিল, তাদের মধ্যে সে ব্যক্তিও ছিল যে রসূলে করীম (সা.)-এর মেয়ে হযরত জয়নব (রা.)-এর মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল। ঐ ব্যক্তির নাম ছিল, হাব্বার।

সে হযরত জয়নবের (রা.) উটের বেল্ট কেটে দিয়েছিল। ফলে তিনি (রা.) উটের পিঠ থেকে নীচে পড়ে গিয়েছিলেন এবং তাতে তার গর্ভপাত ঘটেছিল, যার ফলে দিন কয়েকের মধ্যে তিনি মারা যান। এছাড়াও, সে আরো অনেক মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছিল। ঐ ব্যক্তিও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকটে উপস্থিত হলো এবং বললো ঃ

'হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি আপনার কাছ থেকে পালিয়ে ইরানের দিকে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি চিন্তা করে দেখলাম যে, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর নবীর মাধ্যমে আমাদের শিরকের ধারণা দূর করে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে আধ্যাত্মিক ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আমি অপর দেশের লোকদের কাছে যাওয়ার বদলে তাঁর কাছে কেন ফিরে যাই না এবং নিজের পাপের কথা স্বীকার করে কেন তাঁর কাছে ক্ষমা চাই না।'

রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন ঃ

'খোদা যখন তোমার হৃদয়ে ইসলামের ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তখন আমি কেন তোমার অপরাধ ক্ষমা করব না ? যাও, আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। ইসলাম তোমার পূর্বের সকল পাপ মুছে ফেলেছে।'

(সীরাতুল হুলবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০৬, ১৯৩৫ সালে মিশরে প্রকাশিত সংস্করণ)

এখানে এতটা সুযোগ নেই যে, আমি এই রচনাকে দীর্ঘ করি। নয়তো, এমন সব ভয়ানক অপরাধীকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) অতি সামান্য ওসিলাতেই ক্ষমা করে দিয়েছেন, যাদের অপরাধের ঘটনা ছিল বর্ণনাতীতভাবে হৃদয় বিদারক এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দয়াশীলতা এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, তাঁর দয়া দেখে যে কোন কঠিন হৃদয়ের মানুষও প্রভাবিত না হয়ে পারে না।

(পুস্তক নবীনেতা, পৃষ্ঠা: ১৯২-২১১)

প্রথম পাতার পর.....

যখন সেই আঙ্গুর 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' বলে গ্রহণ করলেন, তখন খৃষ্টধর্মের স্মৃতি তার মনের মধ্যে পুনরায় উদিত হল। তার মনে হলো, তার সামনে খোদার এক নবী বসে আছেন, যিনি ইসরাঈলী নবীদের মতই কথা বলছেন। তাকে রসুলে করীম (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার দেশ কোথায়?' উত্তরে সে যখন বলল, 'নিনেভা'। তখন তিনি বললেন, সেই সাধু ব্যক্তি ইউনুস (আ.) যিনি মত্তার পুত্র এবং নিনেভার বাসিন্দা ছিলেন, তিনিও আমার মতই খোদা তা'লার একজন নবী ছিলেন। তিনি তখন আদ্দাসের কাছে তবলীগ শুরু করে দিলেন। আদ্দাসের চিন্তাপ্লুত মন ক্ষণিকের মধ্যেই বিস্ময়ে ভরে গেল। এবং বিস্ময় তার ঈমানে পরিবর্তন ঘটালো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই অপরিচিত ক্রীতদাস অশ্রুভরা চোখে আঁ হযরতের পদতলে লুটিয়ে পড়ল। এবং তাঁর হাতে পায়ে চুম দিতে লাগল। "

(নবীনেতা, পৃষ্ঠা: ৪৯, প্রণেতা:মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ)

পাঠকবর্গ! লক্ষ্য করুন, আঁ হযরত (সা.) আদ্দাসকে তবলীগ করার সুযোগটুকুও হাতছাড়া করেন এবং তাকে মুসলমান বানিয়ে আগুন থেকে রক্ষা করেন। যদিও তাঁর সারা শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছিল, ভয়ানক আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন এবং নিদারুন ক্লান্তি এবং দুর্বলতায় তিনি লুটিয়ে পড়ছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রসুলে করীম (সা.) কে জিজ্ঞাসা করি যে, আপনার জন্য ওহদের দিনের থেকেও বেশি কষ্টের দিন কোনটি ছিল? (ওহদের যুদ্ধে হুযুরের দাঁতা শহীদ হয়ে গিয়েছিল) হুযুর (সা.) বলেন, আয়েশা তোমার জাতির পক্ষ থেকে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু উকবার দিন নিদারুন কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি, যখন আমি সত্যের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য তায়েফে ইবনে আব্দ ইয়ালিল -এর কাছে যাই (যাতে সে সেখানকার মানুষকে সে জুলুম-অত্যাচার থেকে বিরত রাখে এবং তবলীগের বিষয়ে আমার সহায়তা করে), কিন্তু সে আমার কোন সাহায্য করে নি। আর মানুষের অত্যাচার এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, অতিশয় দুঃখ ও ক্লান্তির কারণে এটাও জানতে পারি নি যে, আমি কোন দিকে যাচ্ছি, যতক্ষণ না আমি বিশ্রামের জন্য 'কুরনে সুয়ালিব' (একটি পর্বত শিখর)-এর ছায়ায় কিছুক্ষণ বসি। সেখানে বসে মাথা তুলে দেখি আকাশে মেঘ ছায়া করে আছে আর তার মধ্যে জিবরাঈল আছেন। জিবরাঈল বললেন, আল্লাহ্ সব কিছু শুনেছেন যা তোমার জাতি তোমাকে বলেছে এবং সে সব কষ্টও দেখেছেন যা তোমাকে তারা দিয়েছে। আল্লাহ্ আমার সাথে পাহাড়ের ফিরিশতা পাঠিয়েছেন যাতে তুমি এদের বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত করবে তারা তা পূর্ণ করে। এরপর পাহাড়ের ফিরিশতরাও আমাকে সালাম করে এবং বলে, হে মুহাম্মদ (সা.) আমি পাহাড়ের ফিরিশতা। তোমাকে তোমার জাতি যা কিছু বলেছে এবং তোমাকে যে কষ্ট দিয়েছে তা সব কিছু আল্লাহ্ তা'লা দেখেছেন এবং শুনেছেন। আমাকে তোমার সাহায্যের জন্য তিনি পাঠিয়েছেন। আপনি আমাকে যে আদেশই করবেন আমি তা পালন করব। আপনি যদি বলেন, আমি দুই পাহাড়কে (যে দুটি পাহাড়ের অন্তবর্তী স্থলে তায়েফ অবস্থিত) পরস্পর মিলিয়ে দাও আর এর মধ্যবর্তী স্থানে বাসিন্দাদের পিষে ফেল তবে আমি এমনটিই করব। একথা শুনে রসুলে করীম (সা.) পাহাড়ের ফিরিশতাকে বললেন, আমি আশা করি, এদের মধ্য থেকে শিরক থেকে মুক্ত এবংএকেশ্বরবাদী এক জাতির সৃষ্টি হবে। এই কারণে আমি এদেরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার অনুমতি দিতে পারি না। (মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ)

সুধী পাঠকবর্গ! লক্ষ্য করুন! যখন পাহাড়ের ফিরিশতা বলল, অনুমতি দিলে তায়েফের দুই দিকের পাহাড়কে একত্রে মিলিয়ে দিয়ে তাদের ধৃষ্টতার শাস্তি দিব। আর তাদের মধ্যে কেউই জীবিত থাকবে না।' একথা শুনে আঁ হযরত (সা.) কি উত্তর দিলেন? তিনি বললেন, ' আমি আশা করি এদের মধ্য থেকে শিরক থেকে পবিত্র একেশ্বরবাদী এক জাতির জন্ম হবে।' তাঁর অন্তরে কি এক উদগ্র ব্যকুলতা ছিল যে, সমগ্র মানবজাতি যেন নিজেদের প্রকৃত স্রষ্টাকে চেনে এবং পৃথিবীতে কেউ যেন মুশরিক হিসেবে অবশিষ্ট না থাকে।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ২০ শে এপ্রিল, ২০১৮ তারিখের প্রদত্ত খুতবা জুমায় বলেন:

"আঁ হযরত (সা.) একবার হযরত আলিকে সম্বোধন করে বলেন, খোদার কসম! তোমার দ্বারা একজন মানুষের হিদায়াত পাওয়া তোমার জন্য উন্নত মানের লাল উট লাভ করার চেয়ে শ্রেয়। তোমার তবলীগ যদি কারো জন্য হিদয়াতের মাধ্যম হয়, তবে এই জগতের ধন-সম্পদ এর তুলনায় কোন মূল্যই রাখে না। আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন তবলীগ করা এবং পৃথিবীববাসীর হেদায়তের জন্য সময় ব্যায় করা।"

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সৈয়্যদানা ও মৌলানা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন এবং হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নির্দেশ অনুসারে আমরা যেন তবীলগ ও পুণ্যকর্মের মাধ্যমে মানবজাতির হেদায়াতের উপকরণ সাব্যস্ত হই।

(মনসুর আহমদ মসরূর)

আঁ হযরত (সা.)-এর সরল ও সাধারণ জীবন

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)-এর রচনা, অনুবাদ: মির্যা সফিউল আলাম (মুবাল্লিগ সিলসিলা)

আমাদের পথ-প্রদর্শক নবী আঁ হযরত (সা.) সমগ্র বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ এসেছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সমগ্র বিশ্বের জন্য আদর্শ নামে অভিহিত করেছেন। তাই তিনি আমাদের জন্য যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেটিই সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ এবং আমাদের জন্য অনুকরণীয়। তিনি নিজের কর্মবিধি দ্বারা আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে, পবিত্র ও পুণ্যময় প্রবৃত্তিকে কোনক্রমেই দমন করা বৈধ নয়, সেগুলিকে বরং আরও বিকশিত করা উচিত। আর যে সমস্ত আবেগের কারণে পাপ ও মন্দকর্মের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় সেগুলিকে গোপন না রেখে নির্মূল করা আবশ্যক। অতএব আমরা যদি সংকোচ বশতঃ এমন কিছু বিষয় নিয়ে উল্লেখ না করি যেগুলি আমাদের ধর্মের জন্য উপযোগী, তবে আমরা ভুল করছি। আর যদি আমরা সেই সমস্ত কথা যেগুলি বলা ইসলামের দৃষ্টিতে আমাদের জন্য বৈধ, সংকোচের কারণে বলি না, কিন্তু আসলে আমরা তার প্রতি আগ্রহী, তবে এটি কপটতা। আর যদি মানুষের দৃষ্টিতে সম্মান অর্জনের জন্য নিজেকে কেউ নীরব ও গম্ভীর বানিয়ে রাখে তবে এটি শিরক। আঁ হযরত (সা.) -এর জীবনে এমন একটিও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না যা থেকে জানা যায় যে, তিনি (সা.) এই তিনটি উদ্দেশ্যের মধ্যে কারো জন্য সংকোচ বা কৃত্রিমতা করেছেন। বরং তাঁর জীবন অত্যন্ত সরল এবং নির্বিবাদ হিসেবে প্রতীয়মান হয় যা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি নিজের সম্মানকে মানুষের হাতে মনে করতেন না, বরং সম্মান ও লাঞ্ছনার অধিকারী খোদাকেই জ্ঞান করতেন।

ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে কৃত্রিমতা

ধর্মীয় নেতাদের এদিকে সজাগ দৃষ্টি থাকে যে, তাদের ইবাদত এবং যিকর যেন অন্যদের তুলনায় বেশি হয়। তারা বিশেষভাবে কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয়, যাতে মানুষ তাদেরকে অত্যন্ত পুণ্যবান বলে মনে করে। মুসলমান হলে ওজুর বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিবে এবং বেশ সময় ধরে ওজুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে ধুতে থাকবে। অন্যদের ওজুর পানির ছেঁটা এড়িয়ে চলবে, সিজদা ও রুকু দীর্ঘ করবে। চেহারায় বিশেষ বিনয়ভাব প্রকাশ করবে এবং অবিরাম ওযীফা পাঠ করতে থাকবে। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) সব থেকে বেশি মুত্তাকি ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর মত খোদাভীতি কেউ নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি উপরোক্ত বিষয়গুলিতে একেবারেই সাধারণ ছিলেন। তাঁর জীবন এই সব কৃত্রিমতা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ছিল।

শিশুর কান্না শুনে নামাযে শীঘ্রতা

"اِنِّیْ لَاَقُوْمُ فِی الصَّلٰوۃِ اُرِیْدُ اَنْ اُطَوِّلَ فِیْھَا فَاَسْمَعُ بُکَاءَ الصَّبِیِّ فَاَتَجَوَّزُ فِیْ صَلٰوتِیْ کَرَاھِیَۃَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰی اُمِّہٖ (بخاری

আবি কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আঁহযরত (সা.) বলেছেন: আমি অনেক সময় নামাযে দাঁড়িয়ে নামায দীর্ঘায়িত করতে চাই, কিন্তু কোন শিশুর কান্নার শব্দ শুনে নামায সংক্ষিপ্ত করে দিই, এই ভয়ে যে পাছে শিশুর মাকে কষ্টে না ফেলি।

কেমন সরলতার সঙ্গে তিনি বললেন, শিশুর কান্না শুনে নামায তাড়াতাড়ি পড়িয়ে দিই। বর্তমান যুগের সুফীরা এমন বিষয়কে নিজের অসম্মান মনে করে, কেননা, তারা একথা প্রকাশ করাকে নিজেদের জন্য গর্ব মনে করে যে, আমরা নামাযে এতটাই মগ্ন হয়ে পড়েছিলাম যে বুঝতেই পারি নি আর পাশে ঢোল বাজতে থাকলেও কিছু বুঝতে পারি না। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) এই সমস্ত কৃত্রিমতা থেকে পবিত্র ছিলেন। খোদা তা'লা তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছেন, কোন মানুষ তাঁকে সম্মানীয় করে নি। এমন চিন্তাধারা তাদেরই যারা মনে করে যে মানুষ সম্মান দেয়।

জুতো পায়ে নামায পড়া

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.)কে প্রশ্ন করা হয় যে, তিনি কি জুতো পরিহিত অবস্থায় নামায পড়তেন? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ পড়তাম।

এই ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তিনি কিভাবে কৃত্রিমতা এড়িয়ে চলতেন। এখন সেই যুগ আগত যখন কি না সেই সব মুসলমানরা যারা ঈমান এবং ইসলাম সম্পর্কে অনবিহিত, তারা যদি কাউকে জুতো পায়ে নামায পড়তে দেখে তবে চিৎকার চেঁচামেচি আরম্ভ করে দিবে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ তাদের ধারণা অনুসারে যাবতীয় শর্তাবলী পূরণ না করে তারা বরদাস্ত করতে পারবে না। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) যিনি আমাদের জন্য আদর্শ তাঁর কর্মবিধি এমনটি ছিল না। বরং তিনি বিষয়কে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন, তিনি কোন কৃত্রিমতার প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন না। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের জন্য পবিত্রতা একটি শর্ত, আর এটি কুরআন এবং হাদীস থেকে প্রমাণিত। অতএব যে জুতো পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং সাধারণত যে যে স্থানে নোংরা লাগার ভয় থাকে সেখানে যদি পরে না যায় তবে প্রয়োজনে সেই জুতো পরিহিতি অবস্থায় নামায পড়তে কোন অসুবিধা নেই। আর এমনটি করে তিনি উম্মতের উপর এক বিরাট অনুগ্রহ করেছেন, তাদেরকে পরবর্তীকালের কৃত্রিমতা থেকে রক্ষা করেছেন। এই উত্তম আদর্শের দ্বারা তাদের উপকৃত হওয়া উচিত যারা বর্তমানে এবিষয়গুলি নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয় আর কৃত্রিমতার পেছনের উন্মাদনা প্রকাশ করে। যে কাজের ফলে ঐশী মাহাত্ম্য এবং তাকওয়ার বিষয়ে কোন তারতম্য ঘটে না, সেই কাজ সম্পাদনে মানুষের সম্মানে কোন হেরফের ঘটে না।

অনাহুতদের জন্য অনুমতি চাওয়া

হযরত ইবনে মাসুদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন,

قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهٗ اَبُوشُعَيْب وَكَانَ لَهٗ غُلَامٌ لَحَّامٌ ۔فَقَالَ اصْنَعْ لِی طَعَاماً اَدْعُوا رَسُوْلَ اللّٰہ ﷺ خَامس خَمْسَۃَ فَدَعَا رَسُوْلَ اللّٰہِ ﷺ خَامِس خَمْسَۃ فَتَبِعَھُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِی ﷺ اِنَّکَ دَعَوْتَنَا خَامِس خَمْسَۃ وَھٰذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا فَاِنْ شِئْتَ اَذِنْتَ لَهٗ وَاِنْ شِئْتَ تَرَکْتَہ۔ قَالَ بَلْ اَذِنْتُ لَهٗ۔

এক আনাসারী সাহাবী ছিলেন যাঁর নাম ছিল আবু শোয়েব। তাঁর এক ক্রীতদাস ছিল যে কসাইয়ের কাজ করত। তাকে তিনি আদেশ দেন যে, আমার জন্য খাদ্য প্রস্তুত কর, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)কে চার সাহাবা সহ ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ জানাব। এরপর তিনি রসুলে করীম (সা.)কেও আমন্ত্রণ জানিয়ে পাঠান যে, হুযুর (সা.) এবং চারজন সাহাবার দাওয়াত রয়েছে। তিনি (সা.) তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্যে যখন যাচ্ছিলেন তখন পথে আরও একজন সঙ্গ নেয়। তিনি (সা.) সেই সাহাবার বাড়ি পৌঁছে বলেন, তুমি তো আমাদের পাঁচ জনের দাওয়াত করেছিলে। এখন এই ব্যক্তিও আমাদের সঙ্গে এসেছে। এখন বল যে, একেও ভিতরে আসার অনুমতি দিবে কি না? তিনি বললেন, হে রসুলুল্লাহ্! অনুমতি আছে। অতঃপর তিনি সেই ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করলেন।

এই হাদীসে থেকে জানা যায় যে, তিনি (সা.) কিভাবে নিঃসংকোচে কোন বিষয় উপস্থাপন করতেন। হয়তো তাঁর স্থানে অন্য কেউ হলে চুপ করেই থাকত। কিন্তু তিনি (সা.) পৃথিবীর জন্য আদর্শ হয়ে এসেছিলেন। তাই তিনি (সা.) প্রত্যেকটি বিষয়কে যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজে আমল করে দেখাতেন, আমাদের জন্য কঠিন হত। তিনি নিজের কর্মবিধি দ্বারা বলে দিয়েছেন যে, সরলতা ও অনাড়ম্বরতাই মানুষের জন্য কল্যাণকর। এবং তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর সম্মান কৃত্রিমতার মধ্যে নিহিত নয়, বরং তাঁর সম্মান খোদার পক্ষ থেকে ছিল।

সংসারের ব্যায় নির্বাহে সরলতা ও অমায়িকতা

তাঁর জীবন যাপন পদ্ধতিও ছিল অতি সাধারণ। ধনীরা সাংসারিক খরচাদির বিষয়ে যে সমস্ত অপব্যায় ও আড়ম্বরে অভ্যস্ত, তিনি সে সবের ধারে কাছেও যেতেন না। তিনি এমন সাধারণ জীবনযাপন করতেন যে, জগতের বাদশাহরা তা দেখেই বিস্ময়ে ডুবে যাবে। এবং এর

উপর আমল করা তো দূরের কথা, ইউরোপের বাদশাহ হয়তো একথা স্বীকার করতেও রাজি নয় যে এমনও কোন বাদশাহ ছিল যার ভাগ্যে ধর্মীয় জগতের রাজত্ব ছিল আর জাগতিক রাজত্বের দায়িত্বও পেয়েছিলেন; কিন্ত তা সত্ত্বেও নিজের খরচাদির বিষয়ে এমন মিতব্যায়িতা ও অমায়িকতা অবলম্বন করতেন। অথচ তিনি কার্পণ্য করতেন না, বরং পৃথিবীতে আজ অবধি যত উদার ও মহানুভব ব্যক্তির জন্ম হয়েছে, তিনি তাদের সকলের চেয়ে বেশি উদার ছিলেন।

ধনীদের অবস্থা

যাকে আল্লাহ্ তা'লা ধনসম্পত্তি এবং প্রাচুর্য দান করেন, তাদের অবস্থা মানুষের অগোচরে থাকে না। দরিদ্র থেকে দরিদ্র দেশেও আনুপাতিক হারে ধনী সম্প্রদায়ের মানুষ থাকে। এমনকি বন্য ও বর্বর জাতি ও গোষ্ঠী সমূহের মধ্যেও কোন না কোন ধনী সম্প্রদায় থাকে। তাদের এবং অভাব-পীড়িতদের জীবনযাপন পদ্ধতিতে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকে তা কারো অগোচরে থাকে না। বিশেষত যে সমস্ত জাতিতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে তাদের ধনীদের জীবনে এমন বিলাসিতা এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ থাকে যে তাদের ব্যায়বহুলতা সীমা ছাড়িয়ে যায় ।

আঁ হযরত (সা.) যে জাতির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন সেই জাতিরও গর্ব প্রকাশ এবং আড়ম্বরতায় বিশেষ খ্যাতি ছিল। আরব সর্দাররা এক বিরল জনঘনত্বের একটি দেশের অধিবাসী হওয়া সত্বেও কয়েক ডজন করে ক্রীতদাস রাখত এবং তারা গৃহের শোভা বৃদ্ধিতে অভ্যস্ত ছিল।

আরব সংলগ্ন ভূখন্ডে এমন দুটি জাতির বাস ছিল যারা নিজেদের শক্তির বিচারে তৎকালীন জ্ঞাত জগতের উপর রাজত্ব করত। একদিকে পারস্য প্রাচ্যের সভ্যতার বৈভব ও গৌরব সহকারে পুরো এশিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার করে ছিল। অন্যদিকে রোম পাশ্চাত্যের দর্প ও গৌরব নিয়ে সমগ্র ইউরোপ এবং আফ্রিকায় আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এই দুটি দেশ প্রাচুর্য ও বিলাসিতায় বর্তমান যুগের দেশগুলিকে যোজন যোজন পেছনে ফেলে দিত। সুখ-সাচ্ছন্দ এবং বিলাসিতার এমন এমন উপকরণ তৈরী হয়ে গিয়েছিল যে, কিছু কিছু বিষয়ে তারা বর্তমান যুগের থেকেও এগিয়ে গিয়েছিল। ভোগ-বিলাসের উপকরণ চরম উৎকর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল যা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখা হয়। ইরানের দরবারে সম্রাট যে মর্যাদা ও বৈভব নিয়ে সিংহাসনে বসতে অভ্যস্ত ছিল এবং তাদের গৃহে যে পরিমাণ ভোগ-বিলাসের সরঞ্জাম একত্রিত ছিল, 'শাহনামা'র পাঠকরা তা ভালভাবে বুঝতে পারবে। যারা ইতিহাসের পুস্তকে এই সমস্ত সাজ সরঞ্জামের বিষয়ে সবিস্তারে অধ্যয়ন করেছে, তারা তো বেশ ভালই অনুমান করতে পারবে। শাহী দরবারের কলিনেও মনিমাণিক্য লাগানো ছিল এবং বাগানের কারুকাজে পান্না ও মুক্তা খচিত কলিন দ্বারা দরবারের ময়দানকে শাহী বাগান সদৃশ বানিয়ে দেওয়া হত। হাজার হাজার সেবক এবং দাস ইরানের বাদশাহর সঙ্গে থাকত। সবসময় ভোগ-বিলাসেই তারা মত্ত থাকত।

রোমী বাদশাহও ইরানীদের থেকে কোন অংশে কম যায় না। ইরানের বাদশাহ্‌র এশীয় বৈভব ও মযার্দার বিপরীতে রোমী বাদশাহ পাশ্চাত্যের সৌন্দর্য এবং বৈভবের অনুরাগী ছিল। যারা রোমীদের ইতিহাস অধ্যয়ন করেছে তারা জানে যে, রোমান সাম্রাজ্য প্রাচুর্যের সময় কিভাবে খরচ করেছে।

অতএব, যে দেশে ক্রীতদাস রেখে রাজত্ব করাকে গর্ব বলে মনে করা হত এবং যা রোম ও ইরানের মত শক্তিশালী সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল, একদিকে পারস্য সাম্রাজ্যের বিলাসিতা তাদেরকে প্রলুব্ধ করছিল, অন্যদিকে রোমান সাম্রাজ্যের চোখ ধাঁধানো সমৃদ্ধি তাদেরকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করছিল, সেই আরবের মত দেশে জন্ম নিয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর বাদশাহ্ হিসেবে উত্তরণ এবং উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কোনটির দ্বারাই প্রভাবিত না হওয়া এবং পারস্য ও রোমের আকর্ষণের ছোঁয়াচ এড়িয়ে যাওয়া, আরবদের প্রতিমাগুলিকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া-এগুলি কি এমন বিষয় যা দেখার পরও কোন বিবেকসম্পন্ন মানুষ তাঁর পবিত্র ও সত্যবাদীদের নেতা হওয়া এবং আত্মশুদ্ধির বিষয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ করতে পারে? না এমনটি কখনোই হতে পারে না।

সংসারের কাজ নিজে করা

এছাড়াও তাঁর আশপাশে বাদশাহদের জীবনের দৃষ্টান্ত ছিল। কিন্ত তাদের জীবনের কোন প্রভাব তাঁর কোন কর্মে পড়ে নি যা তিনি করে দেখাতেন। এবিষয়টিও ভেবে দেখার যে, তাঁকে আল্লাহ্ তা'লা এমন পদমর্যাদা দান করেছিলেন যে, তিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন। একদিকে রোম তাঁর ক্রমবর্ধমান শক্তিকে এবং অন্যদিকে পারস্য তাঁর অগ্রসরমান সেনাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছিল এবং তারা উভয়েই উদ্বিগ্ন ছিল যে, এই প্লাবনকে প্রতিহত করার জন্য কি পরিকল্পনা করা যায়? সেই কারণে উভয় সাম্রাজ্যের দূতেরা তাঁর কাছে যাতায়াত করত এবং চিঠিপত্র আদান প্রদান আরম্ভ করেছিল। এমতাবস্থায় তাদেরকে দাপট দেখানোর জন্য নিজের সঙ্গে একদল ক্রীতদাস রাখা এবং প্রতাপান্বিত অবতারে আত্মপ্রকাশ করা তাঁর জন্যও আবশ্যক ছিল। কিন্ত তিনি কখনওই এমনটি করেন নি। ক্রীতদাসদের দল তো দূরের কথা, সংসারের দৈনন্দিন কাজের জন্য তিনি কোন ভৃত্য বা সেবক রাখেন নি। নিজেই সব কাজ করে নিতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে,

"اَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُوْنُ فِي مِهْنَةِ اَهْلِهِ تَعْنِي فِي خِدْمَةِ اَهْلِهِ فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ "-

হযরত আয়েশা (রা.) কে প্রশ্ন করা হয় যে, নবী করীম (সা.) বাড়িতে কি কি কাজ করতেন? তিনি (রা.) উত্তর দেন, তিনি (সা.) বাড়ির মহিলাদের সাহায্য করতেন। নামাযের সময় হলে তিনি বাইরে চলে যেতেন।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, তিনি কিরূপ সাধারণ জীবন যাপন করতেন। রাজত্ব থাকা সত্ত্বেও ঘরের কাজকর্মের জন্য কোন ভৃত্য ছিল না। অবসর সময়ে তিনি নিজেই বাড়ির সব কাজ স্ত্রীদের সঙ্গে করতেন।

কতই না সাধারণ জীবন যাপন ছিল। আল্লাহ্ আল্লাহ্॥ কি অসাধারণ নমুনা। এমন কোন মানুষ কি পেশ করা যেতে পারে যার কাছে রাজত্ব আছে সে এমন নমুনা দেখাতে পারে যে, সংসারের কাজের জন্য একজন চাকরও নেই? যদি কেউ দেখাতে পারে তবে সে নিশ্চয়ই তাঁর কোন সেবক হবে। অন্য কোন বাদশাহ্ যে তাঁর দাসত্বের মর্যাদা রাখে না, সে এমন নমুনা কখনোই প্রদর্শন করে নি। এমন মানুষও পাওয়া যাবে যে জগতের ভয়ে তাঁকে ছেড়েই দিয়েছে। এমনও আছে যারা ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই এই জগতেরই হয়ে গেছে। কিন্ত এই নমুনা যেখানে জগতের সংশোধনের জন্য তার বোঝাও নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে নিয়েছেন। আর দেশের শাসনভারও নিজের হাতে রেখেছেন, কিন্ত তা সত্ত্বেও তা থেকে দূরে থেকেছেন এবং তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন নি, বাদশাহ হয়েও দরিদ্র হয়ে থেকেছেন। এই বৈশিষ্ট্য আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর সেবকদের ছাড়া আর কারও মাঝে দেখা যায় না। যাদের কাছে কিছুই ছিল না, এমনকি নিজেদের থাকার ঘরও পেত না। আর শত্রুরা যাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিত না। কখনো কোথাও তো কখনো অন্য কোথাও যেতে হত- তাদের জন্য সাধারণ জীবনযাপন কোন উৎকৃষ্ট নমুনা নয়, যাদের কাছে কিছুই নেই তারা কিভাবে বৈভবপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে? কিন্ত আরব দেশের বাদশাহ্ হয়ে নিজের হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা মানুষের মাঝে বিতরণ করা আর বাড়ির কাজকর্ম নিজের হাতে করা-এগুলি এমন বিষয় যা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন কোন মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ না করে পারে না।

****

মহানবী (সা.) শান্তির দূত

মাহমুদ আহমদ সুমন

মহান রসূল (সা.) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'যারা ঈমান এনেছ, তোমরা তার প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং তার জন্য বেশি বেশি করে শান্তি কামনা কর।'

(সূরা আল আহযাব: ৫৬)

এই হাদীসটি পাঠ করলে বোঝা যায় যে, মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ কতই না উত্তম ছিল। হযরত সাঈদ বিন আবি সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আবু হুরাইরাহকে (রা.) একথা বলতে শুনেছেন যে, রসূলে করীম (সা.) নজদ অভিমুখে যুদ্ধ পরিচালনার সময় সুমামাহ বিন আসালকে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়। সাহাবীরা তাকে মসজিদে নববীর স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে রাখেন। মহানবী (সা.) তার কাছে এসে বলেন, হে সুমামাহ! তোমার সঙ্গে কি ব্যবহার করা হবে বলে তুমি মনে কর? সে বলল, আমার সুধারণা রয়েছে। যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন তাহলে আপনি একজন খুনিকে হত্যা করবেন আর যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করেন তাহলে আপনি এমন এক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন যে এর মূল্যায়ন করতে জানে। কিন্তু যদি আপনি সম্পদ চান তাহলে যত ইচ্ছা নিয়ে নিন। এইভাবেই পরের দিবস উদিত হয়। তিনি (সা.) পরের দিন আবারও আসেন এবং সুমামাহকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার সংকল্প কি? সুমামা বলেন, আমি তো গতকালই আপনার সমীপে নিবেদন করেছি, যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করেন তাহলে আপনি এমন এক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন যে এ অনুগ্রহের মূল্যায়ন করতে জানে। তিনি (সা.) এখানেই কথা বন্ধ করেন আর পরের দিন সূর্যোদয়ের পর পুনরায় বলেন, হে সুমামাহ তোমার নিয়ত কি? সে বলল, আমার যা কিছু বলার ছিল তা বলেছি। একথা শোনার পর রসুল (সা.) বলেন, একে মুক্ত করে দাও। সুমামাহ মসজিদের কাছে খেজুরের বাগানে যান, গোসল করে মসজিদে প্রবেশ করে কলেমা শাহাদত পাঠ করে বলেন, হে মহম্মদ (সা.)! খোদার কসম, পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে বেশি অপছন্দ ছিল আপনার চেহারা। আর বর্তমান অবস্থা এমন যে, আমার কাছে এখন সেই চেহারা সবচেয়ে বেশি প্রিয়। খোদার কসম পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে বেশি অপছন্দ ছিল আপনার ধর্ম আর বর্তমান অবস্থায় আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় হচ্ছে সেই অপ্রিয় ধর্ম। খোদার কসম! পৃথিবীতে আমি সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করতাম আপনার শহরকে আর এখন এই শহরই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়।

রসুল (সা.) তিন দিন পর্যন্ত তাকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করার প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করেন যাতে সে মুসলমানদের ইবাদতের রীতি-পদ্ধতি ও নিষ্ঠা এবং আপন প্রভুর সমীপে কিভাবে অনুনয় বিনয় করে তা দেখতে পায় এবং মুসলমানরা মহানবী (সা.)-এর প্রতি কিভাবে ভালবাসা ও প্রীতি প্রকাশ করে আর তিনি (মহানবী) তার মান্যকারীদের কি শিক্ষা প্রদান করেন। মহানবী (সা.) তাকে সরাসরি ইসলামের কোন তবলীগ করেন নি। কেবল প্রত্যহ জিজ্ঞাসা করতেন, তোমার সংকল্প কী? যাতে বুঝতে পারেন এর ওপর কোন প্রভাব পড়েছে কি না এবং তৃতীয় দিন তার দিব্যশক্তি দিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, এখন এর মধ্যে কোমলতা সৃষ্টি হয়েছে। তাই কোন অঙ্গীকার ছাড়াই তাকে মুক্ত করে দেন।

মহানবী (সা.) -এর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার একটি দৃষ্টান্ত হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে ছিলাম আর তিনি মোটা পাড়ের চাদর পরিহিত ছিলেন। একজন বেদুঈন এসে সেই চাদর ধরে এত জোরে হেঁচকা টান দেয়, যার কারণে হুযুর (সা.)-এর গলায় পাড়ের দাগ পড়ে যায়। এরপর সে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আল্লাহ্ প্রদত্ত এই সম্পদ দিয়ে আমার এই দুটি উট বোঝাই করে দিন। কেননা আপনি আমাকে আপনার নিজস্ব সম্পদ থেকে কিছু দিচ্ছেন না আর আপনার পৈত্রিক সম্পদ থেকেও না। একথা শুনে প্রথমে মহানবী (সা.) নীরব থাকেন এরপর বলেন, 'আল মালু মালুল্লাহি ওয়া আনা আব্দুহু'। অর্থাৎ সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্রই আর আমি তাঁর এক বান্দা মাত্র। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, আমাকে যে কষ্ট দিয়েছ তোমার কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নেওয়া হবে সে বলল, না! মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, কেন প্রতিশোধ নেওয়া হবে না? সে বলল,কেননা আপনি মন্দকে মন্দ দিয়ে প্রতিহত করেন না। একথা শুনে হুযুর (সা.) হেসে ফেলেন। এরপর মহানবী (সা.) নির্দেশ দিলেন, এর একটি উটে জব আর অপরটিতে খেজুর বোঝাই করে দাও।'

(আল শিফাউল কাযী আয়ায, প্রথম খণ্ড)

বর্তমানে আমাদের বিশ্ব যেসব বড় বড় সমস্যায় জর্জরিত এসব পরিস্থিতিকে যদি এক বাক্যে বলতে হয় তাহলে মৌলিক সমস্যা হলো , শান্তি উঠে যাওয়া আর এটি নিরসনে আজ পর্যন্ত যত চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা হয়েছে তা বাহ্যত সবই ব্যর্থ হয়েছে। জাতিসংঘ ব্যর্থ হয়েছে আর এখন ইউনাইটেড ন্যাশনসকে পর্যদুস্ত মনে হচ্ছে। আজ পবিত্র মসজিদে হামলা করে শত শত নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে সর্বত্রই আজ অশান্তি বিরাজ করছে। পুরো মানবজাতি আজ অস্থির। কোথা থেকে এবং কীভাবে শান্তি ফিরে আসবে তা কেউ জানে না। তবে বিশ্বে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে কেবল পবিত্র কুরআনে উপস্থাপিত শিক্ষামালা এবং মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অবলম্বনের মাধ্যমেই। রসুলে পাক (সা.) -এর কল্যাণমণ্ডিত পুরো জীবন এ বিষয়ের জীবন্ত সাক্ষী। তিনি শান্তি ও নিরাপত্তার এক মহান মূর্তিমান প্রতীক হিসেবে জীবনযাপন করেছেন। এবং চরম প্রতিকূল ও কঠিন পরিস্থিতিতেও শান্তির পতাকা উঁচু রেখে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, কুরআনে শিক্ষামালার উপর আমল করলে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তার মাক্কী জীবনী এবং মাদানী যুগেও তার পুরো জীবনাদর্শ এমনসব ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ যে, কিভাবে রসূলে পাক (সা.) তাঁর মান্যকারীদের কোরআনের শিক্ষামালার কল্যাণে শান্তির মূর্তিমান প্রতীক বানিয়ে দিয়েছেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রেও তিনি মুসলমানদের সামনে এক পরম সহানুভূতিপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ উত্তম নৈতিক আদর্শ উপস্থাপন করেছেন। যুদ্ধের নাম নিলেই তো বর্তমান যুগের নামসর্বস্ব সভ্য দেশগুলো নৈতিক আচরণ, সহমর্মিতা এবং ন্যায়বিচারের সব দাবি সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়, কিন্তু বিশ্বশান্তির অগ্রদূত হযরত মুহাম্মদ (সা.) যুদ্ধ এবং হানাহানির ক্ষেত্রসমূহে শান্তি ও নিরাপত্তার উন্নত মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে এমন অতুলনীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন যা সব যুগে পুরো মানবজাতির জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে। মক্কা বিজয়ের দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষী। তাঁর সব খুনী শত্রুদের ক্ষমা করে বিশ্ব ইতিহাসে সেই দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যার কোন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিভিন্ন চুক্তি পালনের ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) সর্বদা এমন আদর্শ দেখিয়েছেন, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা এবং শ্রেষ্ঠ নবীর (সা.) আদর্শ মোতাবেক জীবন পরিচালনার তৌফিক দান করুন। আমীন।

****

হাদীস

لَا تَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ

(মৃত্যুর আকাঙ্খা করো না)

কেননা, মৃত্যুর পর কর্মের ধারা ব্যহত হয়ে যায় এবং খুব সম্ভব এই মৃত্যুর আকাঙ্খা করতে করতে অবশেষে মনে আত্মহত্যার চিন্তার উদয় হয়। মৃত্যুর আকাঙ্খা করার এও অর্থ দাঁড়ায় যে, এমন ব্যক্তি খোদা তা'লার নিয়ামতরাজির অস্বীকারকারী এবং সে মনে করে যে, ইহজগতে তার উপর খোদা তা'লার কোন অনুগ্রহ নাই।

****